সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ

অধ্যাপক

লোকপ্রশাসন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

রেজিঃ নং-৩২৮/২০০৯-১০

লোকপ্রশাসন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেপ্টেম্বর ২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় ভাইয়া

মেজর (অব.) শিব্বির আহমাদ খান কে

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা

বর্তমান বিশ্বে প্রশাসন সম্পর্কে গবেষণা এবং তার উন্নয়নে ব্যপাক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে সরকারি সংগঠন তথা সরকারি প্রশাসন। আর যে দেশের সরকারি প্রশাসন যত দক্ষ সে দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন তত তরান্বিত হয়। বাংলাদেশেও সরকারি সংগঠন তথা সরকারি প্রশাসনের উন্নয়নে অনেক গবেষণা ও সংস্কার অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন বর্তমানে খুবই প্রয়োজনীয় ও সময়ের দাবী। সে কারনেই "সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণা কর্মটির অবতারণা। তাই গবেষণার শেষ লগ্নে গবেষণার কিছু কথা তুলে ধরতে হচ্ছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, গবেষণা কর্মে একজন গবেষকের পাশাপাশি যুক্ত থাকেন অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। শুধু সংশ্লিষ্ট গবেষকের পক্ষেই গবেষণা প্রক্রিয়ার সেইসব ব্যক্তি বর্গের অবদান অনুধাবন করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে যারা তাদের পরামর্শ, মতামত ও সময়োচিত নির্দেশনার মাধ্যমে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন, তাদেরকে আমি আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান জনাব মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, পি.এইচ.ডি. কে, যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ, গঠনমূলক নির্দেশনা বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ এবং আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমাকে পূর্ণ গবেষক হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। তাঁর নির্দেশিত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা ও তথ্য আমাকে গবেষক হিসেবে সুসজ্জিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, অধ্যাপক ড. আকা ফিরোজ আহমদ, ড. আখতার হোসেন ও ড. মোবাশ্বের মোনেম কে, তত্ত্বাবধায়কের পাশাপাশি যারা আমার সার্বিক খোজ খবর ও গবেষণার বিষয় বস্তু সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, লোকপ্রশাসন বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র, স্নেহের ছোট ভাই হেলাল উদ্দীন কে, যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগীতা গবেষণা কাজকে এগিয়ে নিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, লাইব্রেরিয়ান, কম্পিউটার ল্যাব পরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের।

আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে বিভিন্ন লেখক ও গবেষকের বই, প্রবন্ধ,, পত্র পত্রিকা ও গবেষণা প্রতিবেদনের সাহায্য নিতে হয়েছে, সময়ের সল্পতা ও নানারকম সীমাবদ্ধতার কারনে তাদের নিকট থেকে অনুমতি নিতে পারিনি, এজন্য আমি তাদের নিকট বিশেষভাবে ঋনী।

পরিশেষে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি গবেষণা এলাকার সাক্ষাৎদানকারীদের প্রতি, যাদের নিকট থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাঁরা ধৈর্য সহকারে সাক্ষাৎকার দিয়ে আমাকে সঠিক তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন।

মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-৩২৮/২০০৯-১০

সেপ্টেম্বর, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণরুপে আমার নিজস্ব। আমার জানা মতে ইতপূর্বে এই শিরনামে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত এই গবেষণা কর্মটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
রেজি: নং-৩২৮/২০০৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, এম.ফিল. গবেষক, রেজি. নং-৩২৮/২০০৯-১০ কর্তৃক উপস্থাপিত "সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে তার এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিক অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনপ্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ
অধ্যাপক
লোকপ্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়সূচি

ক্র.ন.	বিষয়	পৃষ্ঠা
	উৎসর্গ	I
	গবেষকের কথা	III
	ঘোষণাপত্র	IV
	প্রত্যয়নপত্র	V
	অধ্যায় এক : ভূমিকা	**১**
১.১	প্রারম্ভিকা	১
১.২	গবেষণার উদ্দেশ্য	২
১.৩	গবেষণার যৌক্তিকতা	৩
১.৪	সাহিত্য পর্যালোচনা	৩
	অধ্যায় দুই ঃ গবেষনা পদ্ধতি	**৬**
২.১	সাক্ষাৎকার পদ্ধতি	৬
২.২	ফোকাসদল আলোচনা	৬
২.৩	বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি	৭
২.৪	তথ্য সংগ্রহের কৌশল	৭
২.৫	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৮
	অধ্যায় তিন : গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো	**৯**
৩.১	সংগঠন	৯
৩.২	সরকারী সংগঠন	৯
৩.৩	বাংলাদেশে সরকারি সংগঠন তথা লোকপ্রশাসনের ক্রমবিকাশ	১০
৩.৪	বাংলাদেশের সরকারি সংগঠন/লোকপ্রশাসন কাঠামো	২৪
৩.৫	বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিস	২৬
	অধ্যায় চার : মানব সম্পদ উন্নয়ন	**২৮**
৪.১	মানব সম্পদ উন্নয়ন	২৮
৪.২	মানব সম্পদ উন্নয়নের উপাদান	৩১
৪.৩	সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন	৩৩
৪.৪	সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়নের ধাপ	৩৩
	অধ্যায় পাঁচ : বাংলাদেশের সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন	**৪০**
৫.১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৪০
	৫.১.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কাঠামো	৪১
	৫.১.২ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী	৪৩
	৫.১.৩ মানব সম্পদ উন্নয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	৪৬
৫.২	বাংলাদেশের সরকারি কর্ম কমিশন	৫০
৫.৩	বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫৪

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এডমিনিস্ট্রেশন একাডেমী ৫৫
৫.৫ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি ৫৫
৫.৬ বাংলাদেশ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট ৫৬
৫.৭ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়া ৫৭
৫.৮ বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র ৫৮
৫.৯ পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমি, সারদা, রাজশাহি ৫৯
৫.১০ পুলিশ স্টাফ কলেজ, মিরপুর ঢাকা ৫৯

অধ্যায় ছয় : সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি ৬০

৬.১ নিয়োগ ৬০
৬.১.১ বিসিএস নিয়োগের আইনি ভিত্তি ৬০
৬.১.২ সরকারি কর্ম কমিশনের ভূমিকা ৬০
৬.১.৩ বিসিএস এ নিয়োগ পদ্ধতি ৬১
৬.১.৪ বিসিএস এ নিয়োগে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স ৬৩
৬.১.৫ বাংলাদেশে নিয়োগ পদ্ধতির সমস্যা ৬৩
৬.১.৬ নিয়োগ পদ্ধতি উন্নয়নের সুপারিশ ৬৪

৬.২ প্রশিক্ষণ ঃ ৬৫
৬.২.১ সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ ৬৫
৬.২.২ প্রশিক্ষণের আইনগত ভিত্তি ৬৫
৬.২.৩ সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা ৬৫
৬.২.৪ ক্যাডার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ৭৭
৬.২.৫ বাংলাদেশে প্রশিক্ষণের সমস্যাসমূহ: ৭৮
৬.২.৬ সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশমালা : ৮০

৬.৩ পদোন্নতি ৮১
৬.৩.১ বাংলাদেশে পদোন্নতি পদ্ধতি ৮১
৬.৩.২ পদোন্নতি বিষয়ক নীতিমালা ৮২
৬.৩.৩ পদোন্নতি নীতির বিবেচ্য বিষয় ৮৬
৬.৩.৪ বাংলাদেশে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ৮৭
৬.৩.৫ সমস্যা দূরীকরণের সুপারিশসমূহ ৮৯

অধ্যায় সাত: বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা ৯১
অধ্যায় আট: সুপারিশমালা ও উপসংহার ১০০
তথ্য নির্দেশ ১০৯
সংযোজনী ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় এক : ভূমিকা

১.১- প্রারম্ভিকা

এক সময় মানব সম্পদকে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের মত সাধারণ একটি উপকরণ মনে করা হত। কিন্তু আজ এটি শুধু উৎপাদনের একটি উপকরণই নয়, একে চিহ্নিত করা হয় সংগঠনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে মানব সম্পদই হলো সংগঠনের প্রকৃত পুজি। সংগঠনের টিকে থাকা ও উন্নতি নির্ভর করে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়নের উপর।

সংগঠনে মানব সম্পদকে, মানব পুজি বলে আখ্যায়িত করা হয়। সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক স্থানে নিয়োজিতকরণ, তাদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ অর্থবহ এবং চ্যালেঞ্জিং কাজ প্রদান এবং সংগঠনের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়।

সরকারি সংগঠন বলতে সরকারি কাজ ও দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে মানব সম্পদের সংগ্রহ, বিকাশ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সকল প্রকার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। সরকারি সংগঠন একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত সংগঠন। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে সরকারি সংগঠনের কার্যকারিতার উপর দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি নির্ভরশীল।

উন্নয়ন একটি গতিশীল ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যাদির মধ্যে স্থান কাল ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়নে যে ধরনের কার্যাদি সম্পাদিত হয় সেগুলো হলো চাকুরী বিশ্লেষণ ও পদবর্গীকরণ, নিয়োগ পর্যায়ে রয়েছে নির্বাচনী পরীক্ষা, যোগ্যতা প্রমাণপত্র ও নিয়োগ পত্র প্রদান, পদ অধিষ্ঠান: নির্দিষ্ট পদের সঙ্গে

ব্যক্তিগত যোগ্যতার সমন্বয়, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন, বেতন কাঠামো বা পারিশ্রমিক পরিকল্পনা: কর্মীর মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণা ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা, অবসর ও অবসর পরিকল্পনা এবং এছাড়া রয়েছে কর্মী সংক্রান্ত গবেষণা।

গবেষণা কর্মটিতে সরকারি সংগঠন বা প্রশাসনের মানব সম্পদ উন্নয়নের তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের সরকারি সংগঠন বিশেষ করে সিভিল সার্ভিসের মানব সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ধাপে ধাপে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত মানব সম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক আলোচনার সাথে সাথে সেগুলোর ত্রুটি বা দূর্বল দিক সমূহ সনাক্তকরণপূর্বক সমস্যা সমূহের সমাধানকল্পে সহায়ক সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্ম কমিশন এবং লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভুমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

১.২-গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

- এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে সরকারি সংগঠন তথা প্রশাসনে বিদ্যমান নিয়ম -নীতি বা কর্মসূচী, যোগ্যতা সম্পন্ন মানব সম্পদ সংগ্রহে কতটুকু ভূমিকা পালন করতে পারছে তা যাচাই করা।
- দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে বিদ্যমান নিয়মনীতি বা কর্মসূচীগুলো কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে তা যাচাই করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়নের নীতি বা কর্মসূচীগুলির দুর্বলতা বা দূর্বল দিক চিহ্নিত করা।
- সরকারি সংগঠনের মানব সম্পদ উন্নয়নের যে কার্যাদি সম্পাদিত হচ্ছে তা যুগোপযোগী বা আধুনিক কিনা তা যাচাই করা।
- নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতিতে আরো পরিবর্তন এনে সংগঠনকে আধুনিক ও বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তোলার সহায়ক সুপারিশ প্রদান করা।

১.৩-গবেষণার যৌক্তিকতাঃ

উন্নয়ন চিন্তার সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ধারনা হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন। বাংলাদেশের সরকারি সংগঠন তথা প্রশাসনের মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশাসনিক সংগঠনসমূহ কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এবং দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে তা খুজে বের করার লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুরণের জন্য প্রয়োজন এর মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং তাদের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন। বাংলাদেশের সরকারি সংগঠন সমূহে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান পদক্ষেপ গুলোর দুর্বল দিক যাচাই করা এবং সেগুলো যুগোপযোগী বা আধুনিক কিনা তা যাচাই করা এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকারি সংগঠন সমূহের মানব সম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি আলোচনার পাশাপাশি বিদ্যমান পদ্ধতির সমস্যা চিহ্নিত করে তা উত্তরণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

১.৪-সাহিত্য পর্যালোচনাঃ

ইসলাম, মোঃ নুরুল (২০১০) ***"মানব সম্পদ উন্নয়ন"***, গ্রন্থটি মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে লেখক মানব সম্পদ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানব সম্পদ উন্নয়ন এর বিভিন্ন উপাদান এবং পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। এছাড়াও গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিস্থিতির সার্বিক দিক আলোচনা করা হয়েছে।

আহমদ, এমাজউদ্দীন (২০০২), ***"বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন"***, গ্রন্থটিতে লেখক বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং ভারত উপমহাদেশের সিভিল সার্ভিসের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। এছাড়া সিভিল সার্ভিসের সামাজিক, অর্থনৈতিক

পটভূমি, প্রশিক্ষণ, ও কর্ম পরিবেশ এবং বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামো, প্রশাসনিক এলিট ইত্যাদির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

রহমান, মোহাম্মদ শামসুর, (২০০৬), "*লোকপ্রশাসন তত্ত্ব ও বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন*", গ্রন্থটির প্রথম দিকে তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ এবং পরে বাংলাদেশের প্রশাসনের কাঠামো ও কার্যগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে রয়েছে প্রশাসন কি? প্রশাসনের উৎপত্তি ও বিকাশ, অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক; সংগঠন কি? সংগঠন তত্ত্ব, সংগঠনের নীতিমালা, কর্মচারী প্রশাসন ইত্যাদি। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামো, বাংলাদেশে কর্মচারী প্রশাসনে নিয়োগ থেকে অবসর সংক্রান্ত সার্বিক ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

Ahmed, Syed Giasuddin (1986), "*Public Personnel Administration in Bangladesh*" বইটি বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস তথা সরকারি কর্মক্ষেত্রে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বই। সরকারি সংগঠনে কর্মী ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দিক সুন্দরভাবে বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

Islam, Monoar (2013), "*Human Resource and Performance Management System for Bangladesh Civil Service.*" বইটিতে লেখক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের Human resource development, Management, Career Planning ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বইটির অন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বাংলাদেশ লোকপ্রশাসনের মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের বর্ণনা এবং এছাড়া বইটিতে BCS Recruitement System, Tranining Policy, Placement and Posting Policy, Performance Management System ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

Kabir, Syeda Lasna and Baniamin, Hasan Muhammad, (2012) ***"Civil Service Training in Bangladesh, an Institutional Analysis of BPATC Role, Rhetoric and Reality."*** বইটি বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। বইটির প্রথমাংশে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতার উপর তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। এর দ্বিতীয়াংশে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এবং তদসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। এর পর বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। বইটির বাকি অংশে বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর বিভিন্ন সময়ে সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণের জন্য গৃহিত পদক্ষেপ এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং এর সাথে সম্পর্কিত যেমন এর সাংগঠনিক অবস্থা, মানব সম্পদের পর্যাপ্ততা, এবং বিপিএটিসি'র সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহের বিস্তারিত আলোচনা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় দুই ঃ গবেষণা পদ্ধতি

২.১-সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি হচ্ছে একটি ব্যাপক প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতি। সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে কোন সংগঠন এবং তার কার্যক্রম সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হওয়া যায়। এই গবেষণাটির জন্য বিভিন্ন সরকারী সংগঠনের নানা পদের কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রশাসন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

- **সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ**

গবেষণার জন্য যে সকল কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় সাক্ষাৎকার তাদের, মধ্যে অন্যতম বহুল প্রচলিত এবং স্বীকৃত পদ্ধতি। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষক উদ্দেশ্যমূলকভাবে আলাপ আলোচনা বা কথোপকথন প্রক্রিয়ায় গকেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করতে পারেন।

২.২-ফোকাসদল আলোচনা

ফোকাসদল আলোচনা সুনির্দিষ্ট গবেষণা উদ্দেশ্যের আলোকে একটি দলীয় আলোচনা বিশেষ "সরকারী সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন" গবেষণার জন্য বিভিন্ন সরকারি সংগঠন এর কর্মচারী কর্মকর্তাদের সাথে ফোকাসদল আলোচনা করা হয়েছে।

- **এই পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ**

ফোকাসদল আলোচনা পদ্ধতিতে দলীয় আলোচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ফলে সময়, অর্থ ও লোকবল কম দরকার হয়। এ পদ্ধতিতে আলোচনা অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী দলের সদস্যরা

খোলামেলা ও মুক্ত পরিবেশে আলোচনা করার সুযোগ পায়। এর ফলে বিষয়বস্তুর বহুমাত্রিক তথ্য আলোচনা থেকে সংগ্রহ করা যায়।

২.৩-বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি

সামাজিক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের একটি বিশেষ ধরনের পদ্ধতি হচ্ছে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি। সরকারি সংগঠনের মানব সম্পদ উন্নয়ন গবেষণার জন্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বই, জার্নাল, সংগীত, চিত্র কর্ম, সংবাদপত্র ইত্যাদি হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- **এই পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ**

বিষয় বস্তু বিশ্লেষণে অল্প সংখ্যক লোকজনের প্রয়োজন হয়। এ পদ্ধতিতে সময় ও তথ্যের খরচ কম হয়। অতীত ঘটনাবলী গবেষণা করে বিশ্লেষণ করা যায়, ফলে নির্ধারিত ঘটনার পরিবর্তনের গতিধারা জানা যায়।

২.৪-তথ্য সংগ্রহের কৌশল

গবেষণা কাজের প্রয়োজনে প্রাথমিক ও গৌণ উভয় প্রকার উৎস হতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

১. প্রাথমিক উৎস

প্রাথমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সরকারী সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২. গৌণ উৎস

তথ্য সংগ্রহের গৌণ উৎসগুলো হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সরকারী সংগঠনে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, ডকুমেন্ট, বই, প্রজেক্ট ডকুমেন্ট, অডিট রিপোর্ট, বার্ষিক প্রতিবেদন, জার্নাল, মনিটরিং রিপোর্ট, দৈনিক পত্রিকা ইত্যাদি।

২.৫-গবেষণার সীমাবদ্ধতা

যে কোন গবেষণা পরিপূর্ণতা নিয়ে সম্পন্ন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। "সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" গবেষণার অন্তর্গত বিষয় একটি চলমান প্রক্রিয়া। গোপনীয়তার নানান ফাঁক-ফোকর থেকে তথ্য উদঘাটন একটি কঠিন ব্যাপার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। শত শত বছরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঘিরে যে ধারা গড়ে উঠেছে তাকে সহজ কোন প্রকরণে ফেলার সুযোগ নেই। এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর থেকে বিভিন্ন রকম লুকোচুরির আশ্রয় নেওয়া হয় সময়ে সময়ে। কোন একটি সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু দেখা গেল সরকারের শাসনামলে বা তার ক্রান্তিকালে এর রিপোর্ট প্রকাশিত হল না। এমনকি সে সম্পর্কে জানা গেল না কিছুই। এরকম অপ্রকাশিত রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য করা গবেষণার নৈতিকতায় অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ। এছাড়া বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় বইপত্রের নিতান্ত অভাব। মাতৃভাষায় বইপত্র, গবেষণা সাময়িকী, প্রতিবেদন তেমন একটা নেই বললেই চলে। দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যেসব তথ্য আছে তার সবই বহু পুরনো। হালনাগাদ তথ্য দুষ্প্রাপ্য। এধরণের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণার জন্য যে পরিমান আর্থিক সংশ্লিষ্ঠতা দরকার তা একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে বহন করা নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার। এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সম্ভবপর একাগ্রতার পরিপূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় তিন : গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

৩.১-সংগঠন

দেশের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংগঠনের প্রয়োজন অপরিহার্য। সংগঠন থেকেই প্রশাসনের শুরু। গোষ্ঠীগত কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সংগঠন। বর্তমান কাজের বিশেষীকরণের সাথে সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের মধ্যে শ্রম বিভাগের প্রয়োজন তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে।

ডিমকের ভাষায় প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে কার্যরত রাখার হাতিয়ার হল সংগঠন।[১]

ই.এন. গ্লোডেন এর মতে, "কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গের মধ্যে যে কার্যকরী সম্পর্ক বিদ্যমান তাই সংগঠন"।

সংগঠন বলতে মুলত একটি যুক্তি সঙ্গত, সুপরিকল্পিত কর্তৃত্ব কাঠামোকে বোঝায়। এই কর্তৃত্ব আদেশাধীন কাজটি কি তা সু-স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা এবং কাজটি বিভিন্ন অংশে সংঘটিত করা হয়। নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন কর্ম বিভাগ ও মানবিক প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করা হয়। **হেনরি ফেয়ল**- "এর মতে সংগঠন মানব ও সাজ সরাঞ্জমের দ্বৈত কাঠামোকে বোঝায়"।

৩.২-সরকারী সংগঠন

সরকারী সংগঠন বলতে সরকারী কাজ ও দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে মানব সম্পদের সংগ্রহ, বিকাশ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সকল প্রকার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। সরকারী সংগঠন একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত সংগঠন। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে সরকারী সংগঠনের কার্যকারীতার উপর দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি নির্ভরশীল।

[১] M.E. Dimock and G.O Dimock, Public Administration 3rd ed. (New Delhi:1964)

Dhaka University Institutional Repository

Liam Sheasby এর মতে,

"A Public Organization is a state-run organization. It is Government controlled and is paid for by public taxation.

অর্থাৎ, সরকারি সংগঠন একটি রাস্ট্র পরিচালিত সংগঠন. এটি সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং জনগণ প্রদেয় ট্যাক্সের মাধ্যমে এর খরচ নির্বাহ করে।

গবেষণাটিতে সরকারি সংগঠন তথা বাংলাদেশ লোকপ্রশাসনের মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৩-বাংলাদেশে সরকারি সংগঠন তথা লোকপ্রশাসনের ক্রমবিকাশঃ

বাংলাদেশ তথা ভারত উপমহাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ইতিহাস অনেক পুরনো হলেও এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন শুরু হয় ব্রিটিশ আমলে। বলা হয়ে থাকে আমাদের আজকের এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার। উপমহাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার বির্বতনের ধারাকে তিন ভাগে আলোচনা করা যায়।

১. ব্রিটিশ আমল (১৭৫৭-১৯৪৭)

২. পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১)

৩. বাংলাদেশ আমল (১৯৭১- বর্তমান)

১. ব্রিটিশ আমল

ব্রিটিশ ভারতে সিভিল সার্ভিস ছিল একটি বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার পর কোম্পানির বাণিজ্যিক সেবা সমূহ থেকে একটি সুসংগঠিত প্রশাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়।

ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তিনটি পর্বে বিকশিত হয়েছে।

১. সওদাগরী পর্ব : ১৬০১ থেকে ১৭৭২

২. আধুনিক সিভিল সার্ভিসের ভিত্তিপত্তন: ১৭৭২-১৮৫৫

৩. ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করনের দাবী : ১৮৫৬-১৯২০

প্রথম পর্ব

লন্ডন কোম্পানী ১৬০১ সালে কিছু সংখ্যক বনিকসহ তাদের সর্বপ্রথম বাণিজ্য জাহাজ প্রেরণ করে। ১৬৭৪ সাল পর্যন্ত এদের চাকরির ক্ষেত্রে কোন শ্রেণী বা গ্রেডের সৃষ্টি হয়নি। এসব কর্মকর্তাদের প্রধান দায়িত্বছিল কোম্পানীর বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।[২] ১৭৬৫ সালে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের "সিভিল সার্ভেন্ট" পদবী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ সালের সনদ আইনে "The convenanted civil service of India" শব্দ গুলোর প্রয়োগ হয়। যদিও তখন তিনটি প্রেসিডেন্সির নাম অনুযায়ী তিনটি সিভিল সার্ভিস বিদ্যমান ছিল। ১৮৭৮ সালে এ বিভাজন সমাপ্ত হয় আর "সর্ব ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্ম হয়। এচিসন কমিশন "কনভেন্যানটেড সিভিল সার্ভিস অব ইন্ডিয়ার" পরিবর্তে "ইম্পিরিয়াল সিভিল সার্ভিস অব ইন্ডিয়া" পদবীর সুপারিশ করেন। কিন্তু তদানন্তীন ভারত সচিব লর্ড ক্রস এতে আপত্তি করেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস এর পর থেকে "দি সিভিল সার্ভিস অব ইন্ডিয়া" নামে পরিচিত হবে। এর পর থেকে কর্মকর্তারা ICS পদবী লেখার রীতি প্রবর্তন করেন। সময়ের দিক থেকেও ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রথম সিভিল সার্ভিসে পরিণত হয়।

[২] এমাজউদ্দীন আহমদ, (২০০২) "বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন" অনন্যা, ঢাকা, পৃ: ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পর্ব

দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাধিগ্রস্থ সওদাগরি চাকরি ব্যবস্থা এক সুদক্ষ, পরিণত ও কার্যকর শাসন ব্যবস্থার রূপ লাভ করে। এক আধুনিক ও কার্যকর শাসন ব্যবস্থা হিসেবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের যে রূপ আমরা দেখেছি তা মূলত হেস্টিং ও কর্ণওয়ালিসের সৃষ্টি। এছাড়া লর্ড ক্লাইভ যখন দ্বিতীয়বার গভর্ণর হিসেবে ভারতে আসেন তখন তিনি শাসন ব্যবস্থাকে এক দক্ষ ব্যবস্থায় পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহন করেন।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধি, তার খ্যাতি ও সুনাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ওয়েলেসলির অবদান চিরস্মরণীয়। তিনিই সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন যে, সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তারা শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নন, এক বিরাট সাম্রাজ্যের প্রশাসন ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

তৃতীয় পর্ব

অনেক দিন পর্যন্ত Convenanted civil service এ ভারতীয়দের অংশগ্রহনের কোন সুযোগ ছিলনা। প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায় থেকে ভারতীয়দের দুরে সরিয়ে রাখার নীতি শুধু যে ভারতেই সমালোচিত হয়েছে তা নয়, মুনরো (Munro), এলফিন স্টোন (Elphinstone), ম্যালকম (Malcolm), হেনরি লরেন্স (Henry Lawrence) প্রমুখ দূর দৃষ্টি সম্পন্ন ইংরেজ কর্মকর্তা ও এ নীতির কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। মুনরো বিশ্বাস করতেন যে, চূড়ান্ত স্বায়ত্ব শাসনের জন্য ভারতীয়দের প্রস্তুত করবার সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের নিয়োগ দেওয়া ও সরকারের সকল পদের জন্য তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ সরকার সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৩ সালের সনদ আইনে লিপিবদ্ধ হয় যে, "ধর্ম, জন্ম স্থান, বংশ, বর্ণ প্রভৃতির জন্য ব্রিটিশ ভারতের কোন ও ভারতে বসবাসরত ব্রিটিশ রাজ্যের কোন প্রজা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কোন কর্ম বা চাকরির ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষিত হবে না।

অবাধ প্রতিযোগীতা (Open Competition)

১৮৫৩ সালের সনদ আইনে সিভিল সার্ভিসের নিয়োগ ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগীতা প্রবর্তিত হলে অনেকে আশা পোষণ করেন, এবার ভারতীয়রা সদর দরজা "দিয়ে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ লাভ করতে পারবেন। অতীতের কুলগত বৈষম্যের অবসান হল। অবাধ প্রতিযোগীতা প্রবর্তিত হবার পর তোষণ নীতির ও অবসান হল। লর্ড ম্যাকলেও দৃঢ় আশা পোষণ করেন, সিভিল সার্ভিসে এবার ভারতীয়দের আশা বাস্তবায়িত হবে। কার্যত কিন্তু অবাধ প্রতিযোগীতা ভারতবাসীর জন্য সিভিল সার্ভিসের দ্বার উন্মুক্ত করেনি। কারণ প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবার ফলে অতি অল্প সংখ্যক যুবক সে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতো। তাছাড়া ভারতের কোনো ছাত্রের পক্ষে ব্রিটেনের ছাত্রদের সাথে সমান পর্যায়ে প্রতিযোগীতা করা সম্ভব হত না।[৩]

২. পাকিস্তান আমল

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসকে বিখ্যাত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সরকারি কাঠামোর উপর এর নিয়ন্ত্রন, নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে এক চেটিয়া অধিকার, ব্যাপক স্বেচ্চাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের প্রবণতা, সর্বপরি এর এলিট চরিত্র সবকিছুর মূলে ছিল ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ঐতিহ্য। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মতো পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য সংখ্যা ছিল অত্যান্ত সীমিত।

[৩] প্রাগুক্ত, এমাজউদ্দীন আহমেদ, পৃ. ৮০

১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৬১ জন। ১৯৭০ সালে এ সংখ্যা হয় মাত্র ৬০১ জন। প্রথম পর্যায় থেকেই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ছিল এক এ লিট সার্ভিস, উচ্চতর পর্যায়ের সকল "সাধারণী" পদ এর জন্য সংরক্ষিত ছিল এবং এর সদস্য বর্গ প্রশাসনের সকল স্তরে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্টিত ছিলেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার শ্রেণী বিভাগ ভারতে যেমন ছিল পাকিস্তানেও ঠিক তেমন ব্যবস্থা অনুসরন করা হয়। স্তরভিত্তিক ও আনুভূমিক সংযোজনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সংগঠিত করে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসের এলিট বৈশিষ্ঠ্য অক্ষুন্ন রাখা হয়।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের মতোই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্যগণ প্রচুর সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিলেন। তাদের বেতনছিল সর্বোচ্চ অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও ছিল প্রচুর।

৩. বাংলাদেশ আমল

বাংলাদেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সূচনা ১৯৭১-এ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে। তবে এর কাঠামোটিছিল ব্রিটিশ ভারত ও পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের আমলে তৈরি। একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কার্যকর তথা জাতি গঠন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহায়ক রূপে প্রতিষ্ঠিত করা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আমলাদের মূল উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোয় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যে সংস্কার ঘটে তা কেবল ছদ্ম পরিবর্তন আনয়ন করে। প্রকৃত চরিত্রের তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রশাসনে এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ করেন যারা পূর্বে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের পুরস্কার স্বরূপ অনেকে নিয়োগ লাভ করে। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে শিল্প, ব্যাংক বীমা জাতীয়করণ করা হলে সেসব প্রতিষ্ঠানে বহু দলীয় নেতাকর্মী নিয়োগ লাভ করে ব্যবস্থাপনার জন্য। এভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী

সময়ে একটি নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।[৪]

মুজিব-শাসনামল (১৯৭১-১৯৭৫)

স্বাধীনতার-পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ করে। ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই সরকারের দায়িত্ব থাকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনঃসংস্কার, বসতিচ্যুত লক্ষ লক্ষ মানুষের পুনর্বাসন, দেশের অর্থনীতিকে বিশ্বায়নের প্রভাব থেকে রক্ষা, অস্থির সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। অপর একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ হচ্ছে নবগঠিত রাষ্ট্রের দিকনির্দেশনাস্বরূপ একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। এ সমস্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার দেশের প্রশাসনিক কাঠামোকে পুনঃনির্মাণের উদ্দেশ্যে বেশকিছু সংস্কার-কমিটি ও কমিশন গঠন করে। এই সরকার তিনটি সংস্কার কমিশন ও কমিটি গঠন করেছিল। সেসব হচ্ছে;

বেসামরিক প্রশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কমিটি (Civil Administration Restoration Committee, CARC):

এই কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ : CARC যেসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করে সেগুলো হচ্ছে:

(ক) ২০ টি মন্ত্রণালয়, তিনটি সচিবালয় এবং ৭টি সাংবিধানিক সংস্থা স্থাপন।

(খ) মহকুমা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের কার্যাবলী সুনির্দিষ্টকরণ।

[৪] আফরোজা রেশমা, (২০১২), "বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কার (১৯৭২-২০০০), পৃ: ১১১।

(গ) সরকারের আইনানুগ ও বিধিবদ্ধ কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান নিশ্চিতকরণ[৫]

কমিটি অনুধাবন করে যে রাষ্ট্র পরিচালনায় বেসামরিক প্রশাসনকে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রধান নীতি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

CARC এর সুপারিশসমূহ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে একটি সুসংগঠিত সচিবালয় গড়ে ওঠে। এতে ২০টি মন্ত্রণালয় এবং এর অন্তর্গত বিভিন্ন শাখা, বিভাগ ও সংস্থা গড়ে ওঠে। অন্যান্য সুপারিশের বাস্তবায়ন ঘটে বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থা গঠনের মধ্য দিয়ে যেমন: সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন কমিশন, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল অফিস। তবে সরকার CARC-র ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ গ্রহণ করেনি। কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত অধিকাংশ সুপারিশ ছিল সামরিক প্রকৃতির। পূর্বে অবিভক্ত পাকিস্তানে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল তারই আদলে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

প্রশাসনিক ও চাকরি পুনবিন্যাস কমিটি (Administrative and Services Re-organization Committee, ASRC):

প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পুনবির্ন্যাস করার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১৫ই মার্চ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পান ডঃ মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৪ জন। ASRC তাদের সুপারিশসমূহ দুইটি পর্যায়ে সরকারের কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু মুজিব শাসনামলের শেষসময় পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে কমিশনের এসব সুপারিশ সম্পর্কে কোনো সাড়া মেলেনি। বোঝা কঠিন, কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সবাই ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিকভাবে মুজিব সরকারের নিকটজন হওয়া সত্ত্বেও কেন ASRC-এর সুপারিশসমূহ কেবলই ফাইলবন্দি হয়ে থাকল। বলা হয়ে থাকে সরকারের উচ্চপদস্থ অনেক আমলার কর্মদক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাব দেখে বঙ্গবন্ধু ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি সমস্যার স্বরূপ

[৫] CARC Report, part 1, 1972:2-8.

অবগত ছিলেন, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি। সে কারণেই সংস্কারের এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি।

ন্যাশনাল পে-কমিশন (NPC-1)

১৯৭২ সালের ২১ জুলাই সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিবের নেতৃত্বে প্রথম জাতীয় পে-কমিশন গঠিত হয়। সভাপতির পাশাপাশি কমিশনে আরো নয় জন সদস্য ছিলেন। প্রথম জাতীয় পে-কমিশন (NPC-1)-এর ওপর একাধিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এগুলো হল:

(ক) সরকারের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখে পাবলিক সেক্টরের আওতাধীন সকল কর্মচারির বেতন কাঠামোর মূল্যায়ন।

(খ) তদানীন্তন কেন্দ্রীয় এবং প্রদেশিক সরকারের কর্মচারিদের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ-পূর্বক যৌক্তিক বেতনস্কেলের সুপারিশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুপারিশ প্রণয়নের পূর্বে কমিশনকে নানা রকম পরিবর্তনশীল চলক বা নিয়ামকের বিষয় বিবেচনায় রাখতে বলা হয়েছিল। যেমন, বাজার ব্যবস্থার বিবেচনায় জীবনধারনের ব্যয়, সরকারের সামর্থ্য, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উপার্জনকারীদের আয়ের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা, মেধাবীদের সিভিল সার্ভিসে আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা, কর্মদক্ষতার পুরস্কার, চাকুরেদের কর্মে উৎসাহ সৃষ্টি এবং দুর্নীতি যাতে বিস্তার লাভ করতে না পারে।

জিয়ার শাসনামল (১৯৭৫-৮১)

পে অ্যান্ড সার্ভিসেস কমিশন (P&SC): ১৯৭৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পে অ্যান্ড সার্ভিসেস কমিশন গঠিত হয়। চেয়ারম্যানসহ এই কমিশনে তেরো জন সদস্য ছিলেন।

উদ্দেশ্য (Mission): বেশ কিছু কাজের ভার P&SC-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। যেমন,

Dhaka University Institutional Repository

(ক) পাবলিক সেক্টরের অন্তর্গত প্রতিরক্ষা বিভাগের বেসামরিক চাকুরেগণ, স্বায়ত্বশাসিত কিংবা আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরেগণ, স্ট্যাটিউটরি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় (শিক্ষকতা পদ ব্যতীত) এবং শ্রমিক ব্যতীত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব (Nationalized) প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত চাকুরেগণের তৎকালীন বেতন এবং চাকরি কাঠামো পর্যবেক্ষণ।

(খ) সিভিল সার্ভিসের জন্য একটি উপযুক্ত কাঠামো সুপারিশ যাতে কর্মচারিদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং পদায়ন-পদ্ধতির বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে।

(গ) তদানীন্তন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক চাকুরেগণের আত্মীকরণ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন।

(ঘ) সিভিল সার্ভিস, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্ট্যাডিউটরি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় (শিক্ষকতা পদ ব্যতীত) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব (Nationalized) প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরতদের প্রাপ্য সুবিধাদিসহ একটি উপযুক্ত বেতনকাঠামো সুপারিশ (Report of P&SC, Vol.1, 1977: 7)।

P&SC-এর পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে প্রশাসনিক অদক্ষতা ছিল প্রধান আন্তরায়। ASRC-এর মতো এ কমিশনও প্রশাসনে তৎকালীন সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের অবস্থান বিভ্রান্তিকর মনে করে। কেননা, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সরকার CSP-কর্মকর্তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। CSP-কর্মকর্তাদের জন্য পদসংরক্ষণ ও অন্যান্য সার্ভিস থেকে প্রশাসনে আসার সুযোগ না থাকায় পাকিস্তান আমলে নিযুক্ত এসব আমলা একচ্ছত্র সুবিধা ভোগ করতে থাকে। ফলে সিভিল সার্ভিসের এলিট পেশার সহায়ক হিসেবে অপরাপর সার্ভিসের সদস্যগণের ব্যাপক ভূমিকা থাকলেও CSP-কর্মকর্তাদের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকার মতো ব্যাপার ঘটে তাদের জন্য। কমিশন সুপারিশ করে যাতে, জাতীয় উন্নয়নের জন্য বিশেষজ্ঞদের অবদান মূল্যায়ন করা হয় এবং ক্যাডার হিসেবে CSP-এর অধিকার যেন রহিত করা হয়।

এরশাদের শাসনামল (১৯৮২-১৯৯০)

তৎকালীন সেনাপ্রধান লেফটেনেন্ট জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে ক্ষমতা দখল করেন। সামরিক স্বৈরশাসকের চরিত্র অনুযায়ী তিনিও প্রশাসনের সংস্কারকল্পে বেশকিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করেন। সেসব সংস্কার পদক্ষেপ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস/সংস্কার কমিটি (The Committee for Administrative Re-organization/ Reform, CARR):

এ কমিটি গঠিত হয়েছিল সামরিক শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রায়নের উদ্দেশ্যে। এর মুল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক-প্রশাসনিক বিষয়াদি। আমাদের উদ্দেশ্য যেহেতু মূলত সিভিল সার্ভিস-কেন্দ্রিক, সে কারণে এ কমিটির আলোচনা বর্তমান গবেষণার পরিধিভুক্ত নয় বলে বিবেচনা করা যায়। এ কমিটির পাশাপাশি আরো কয়েকটি কমিটি ও দুইটি পে-কমিশন গঠন করা হয়।

সামরিক আইন কমিটি-১ (Martial Law Committee-1): এটি একটি ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি। যার কাজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা।

উদ্দেশ্য (Mission): এই কমিটির কার্যাবলির মধ্যে ছিল:

(ক) সরকারের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও বিভাগের কাজের ধরন পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরামর্শ প্রদান করা।

(খ) এসব অফিস-সংস্থার বর্তমান জনশক্তি পর্যবেক্ষণ ও তার প্রকৃত প্রয়োজন নিরূপণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) এসব অফিস সংস্থার অদক্ষতা-অনিয়ম পর্যবেক্ষণ করে নথিভুক্ত করা ও পরিস্থিতির উন্নয়নে পদক্ষেপ ও পরামর্শ প্রদান।

(ঘ) এসব অফিস-সংস্থার যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করা।

MLC পর্যবেক্ষণ করে যে, কিছু উর্ধ্বতন আমলা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে উপেক্ষা করে সরাসরি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে তাদের স্বার্থসংশিষ্ট নতুন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালায়। এ ধরনের তৎপরতা অহেতুক সরকারের ওপর নতুন নতুন সিভিল সার্ভেন্ট ও কর্মচারি প্রতিপালনের চাপ তৈরি করে।

জাতীয় বেতন কমিশন (National Pay Commission, NPC-II): ১৫ সদস্য বিশিষ্ট NPC-II গঠিত হয় ১৯৮৪ সালের মে মাসে। সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় এ কমিশন।

সরকার নীতিগতভাবে এ কমিটির মূল সুপারিশসমূহ গ্রহণ করে। কিন্তু বেতনস্কেল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কমিটির সুপারিশে কিছু সংশোধন ও পরিমার্জন আনয়ন করে। NPC-II-এর আলোকে সংশোধিত নতুন বেতনকাঠামো (Modified New Scales of Pay, MNSP) ১ জুন, ১৯৮৫ থেকে কার্যকর হয়। তাতে সর্বনিম্ন বেতন স্কেল ৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৬০০০ টাকা নির্ধারিত হয়, যাতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের অনুপাত দাঁড়ায় ১২:১।[৬]

[৬] ATM Obaidullah, (1995). "Recognization of pay policy and Structure in Bangladesh: The Quest for living Wage"

Dhaka University Institutional Repository

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামল (১৯৯১-১৯৯৬)

বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৯১ সালে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে।

প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি (Administrative Reorganization Committee, ARC): ARC নিযুক্ত হয়েছিল ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে। সভাপতিসহ ৬ সদস্য-বিশিষ্ট কমিটির সবাই ছিলেন উচ্চ পদস্থ বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ জন সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিশনের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত ছিল:

(ক) সরকারি প্রশাসনের সংগঠন ও মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামোর মূল্যায়ন করা।

(খ) সত্যিকার অর্থে কী রকম জনবল কাঠামো প্রয়োজন তা নিরূপণ করা।

(গ) পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে সিভিল সার্ভিসের আধুনিকায়নে সরকারি প্রশাসন-যন্ত্রের কীরূপ পুনর্গঠন প্রয়োজন তা প্রস্তাব করা (খান, ১৯৯৪:২৫)।

৯ বার সময় বাড়ানোর পর কমিটি সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়। ARC সুপারিশ প্রণয়নের আগে বিভিন্ন সরকারি কাজের ওপর ব্যাপক-ভিত্তিক জরিপ পরিচালনা করে। এতে কর্মে নিয়োজিতদের কাজের উদ্দেশ্য ধরন ও চাপ, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা, পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করে [৭]

খালেদা জিয়ার শাসনামলে দু'জন সিনিয়র মন্ত্রীর নেতৃত্বে দু'টি উপকমিটি গঠন করা হয়। একটি কমিটির দায়িত্ব ছিল কীভাবে সরকারি চাকুরেদের কর্মদক্ষতা বাড়ানো যায় তা নিরূপণ, এবং অপর কমিটির কাজ ছিল বিভিন্নরকম সরকারি চাকরিতে নিয়োজিতদের বৈতন-বৈষম্য দূরিকরণের উপায় নির্ধারণ। প্রথম কমিটি তাদের প্রতিবেদন তৈরি করলেও, দ্বিতীয় কমিটি তাও করেনি। সরকার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী চাকুরেদের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা

[৭] The Independent, 29 January 1996.

দূরের কথা, তাদের দেওয়া প্রতিবেদন ও তার বিষয়বস্তুও জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। ফলে সেসব কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।

শেখ হাসিনার শাসনামল (১৯৯৬-২০০১)

নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত অবাধ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ১৯৯৬ সালের জুন মাসে দীর্ঘ ২১ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

জাতীয় বেতন কমিশন (National Pay Commission-IV, NPC-IV): নির্বাচনের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষমতারোহণের দু'মাসের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিতদের বেতন বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার গঠন করে জাতীয় বেতন কমিশন (National Pay Commission-IV, NPC-IV)।

NPC-IV-কে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়:

(ক) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি উপযুক্ত বেতনকাঠামো সুপারিশ করা।

(খ) বাড়িভাড়া, চিকিৎসা-ভাতা, যাতায়াতসহ অন্যান্য ভাতা নিরূপণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

(গ) সিভিল সার্ভেন্টদের জন্য পরিবর্তিত বাজারব্যবস্থার আলোকে বেতন ও পেনশন পুনঃনির্ধারণে স্থায়ী নীতিমালা প্রণয়ন।

(ঘ) কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য যথোপযুক্ত পেনশন সুবিধা।

(ঙ) কাজের পুরস্কার ও অবহেলার শাস্তিবিধানের প্রেক্ষাপটে সঠিকভাবে চাকুরেদের দক্ষতা নিরূপণের মাপকাঠি নির্ধারণ।

(চ) বেতন-বৈষম্য দূরীকরণ [৮]

[৮] দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ আগস্ট ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার সংশোধিত আকারে NPC-IV-এর সুপারিশ তিন বছরে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া উক্ত কমিশনের কতিপয় উলেখযোগ্য দিক নিম্নরূপ:

(ক) সর্বোচ্চ বেতন ১৫,০০০ টাকা (নির্ধারিত) এবং সর্বনিম্ন ১,৫০০ টাকা।

(খ) বর্ধিত বেতনের ৬০ শতাংশ ১ জুলাই ৯৭ থেকে এবং বাকি ৪০ শতাংশ ১ জুলাই ৯৮ থেকে প্রদান করা হবে।

(গ) চিকিৎসা ভাতা মাসিক ২০০ টাকার পরিবর্তে ৩০০ টাকা প্রদান করা হবে।

(ঘ) নতুন স্কেল অনুযায়ী উৎসব-ভাতা পরবর্তী অর্থবছর থেকে প্রদান করা হবে (জাতীয় বেতন স্কেল: ১৯৯৭)।

লোকপ্রশাসন সংস্কার কমিশন (Public Administration Reform Commission, PARC: লোকপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে।

এই কমিশনের সুপারিশসমূহের খুব সামান্যই বাস্তবায়িত হয়েছে। PARC-কর্তৃক মোট ১৯টি এজেন্ডাভুক্ত ২৮টি সুপারিশের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত প্রথম দুটি এবং One stop bill payment system- মাত্র এই ৩টি সরকার গ্রহণ করে। অপর আরেকটি সুপারিশ 'ভ্রমণ কর প্রদান সহজায়ন' সরকারের বিবেচনায় ছিল।

৩.৪-বাংলাদেশের সরকারি সংগঠন/লোকপ্রশাসন কাঠামো

বাংলাদেশের লোকপ্রশাসন কাঠামো দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বৃটিশ আমলে গড়ে উঠেছে। সংগত কারণেই ঔপনিবেশিক সময়ের আইনগত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ কাঠামো নির্মিত হয় যার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল আইন শৃংখলা রক্ষা করা, রাজস্ব আদায় করা এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের বানিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করা। সে সময়ে জেলা ছিল মাঠ প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু। সচিবালয় মুখ্যত নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকান্ডে সীমাবদ্ধ ছিল। বৃটিশ পরবর্তী সময়ে ভারত এবং পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে সেই সময়ের সচিবালয় ব্যবস্থা লাভ করে। সমগ্র পাকিস্তান আমলে এ সচিবালয় ব্যবস্থায় বৃটিশ আমলের কাঠামো এবং কার্যাবলি কমবেশি রয়ে যায়। সরকার একটি কেন্দ্রীয় সচিবালয় এবং দু'টি প্রাদেশিক সচিবলায়ের মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতো। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রাদেশিক সচিবলায়কে জাতীয় সচিবলায়ে রূপান্তরিত করা হয়।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোঃ

বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পদসোপানিক ভিত্তিতে সংগঠিত যার শীর্ষে অবস্থান করছে সচিবালয়। বাংলাদেশ সরকারের সমস্ত নীতি ও কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সচিবালয়। সচিবালয় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক প্রদান একজন মন্ত্রী। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় এক বা একাধিক বিভাগ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক বিভাগ বিশেষ ধরণের সরকারি কার্যাবলি সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত। সচিব বা অতিরিক্ত সচিব সচিবালয়ের সাধারণ ডিভিশনের প্রধান। তারা মন্ত্রণালয়ের সমস্ত কর্মকান্ড সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত রাখেন।

টেবিল ১- সচিবালয়ের বিভাগ ও বিভাগীয় প্রধান সমূহ

সচিবালয়ের বিভিন্ন ভাগ	সংশ্লিস্ট ভাগের প্রধান
মন্ত্রণালয়	মন্ত্রী
বিভাগ	সচিব/অতিরিক্ত সচিব
উপ-বিভাগ	যুগ্ম সচিব
ব্রাঞ্চ	উপ সচিব
শাখা	সহকারি সচিব

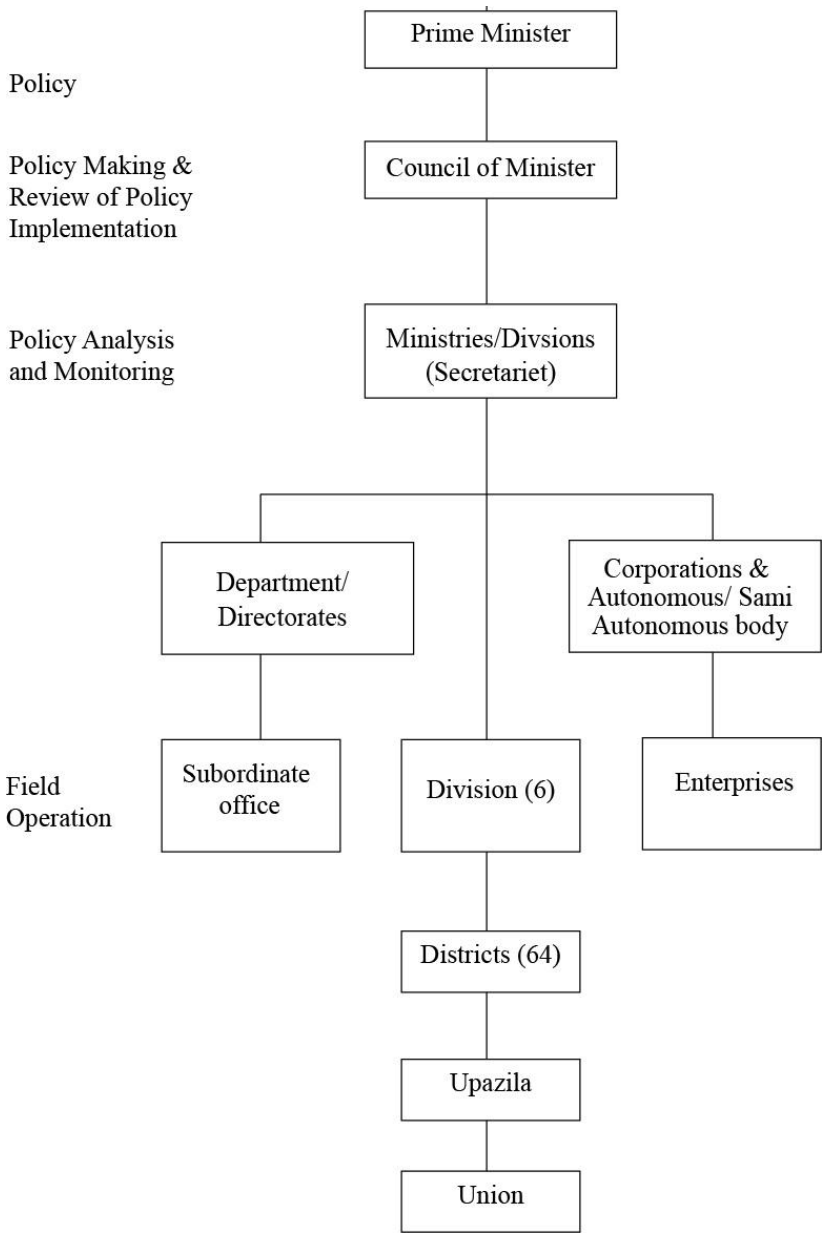

সচিবালয়ের ভূমিকা ও কার্যাবলীঃ

সচিবালয় নিম্ন লিখিত ভূমিকা পালন করে থাকে

১. নীতি প্রণয়ন,

২. পরিকল্পনা গ্রহণ,

৩. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন,

৪. সংসদীয় প্রতি বিধান,

৫. মন্ত্রীকে সংসদীয় দায়িত্বে সহযোগতিা করা,

৬. উর্ধ্বতন পর্যায়ে কর্মী ব্যবস্থাপনা যেমন-

ক. কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের ডিরেক্টর/মেম্বার ও তদুর্দ্ধ কর্মকর্তা।

খ. সংযুক্তি ও অধিনস্ত অফিসে কর্মরত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা।

৭. ক্যাডার সার্ভিসের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কর্মী ব্যবস্থাপনা;

৮. অন্যান্য বিষয়াদি যা বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অর্পন করা হয়।

৩.৫-বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিস

সরকারি দায়িত্ব সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকারি কর্মকান্ডকে বিভিন্ন চাকুরি বিভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও ক্যাডার সার্ভিস বিদ্যমান। বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিস পূর্বতন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ক্যাডার সার্ভিসের আলোকে গঠিত। তদানিন্তন পাকিস্তানে নিখিল পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস সহ মোট ১১ টি কেন্দ্রীয় ক্যাডার ছিল, অন্যদিকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ২৪টি প্রাদেশিক ক্যাডার সার্ভিস বিদ্যমান ছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় ক্যাডারেই নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডারদের নিয়োগ দেওয়া হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারদের সমন্বয়ে বাংলাদেশে নতুনভাবে ক্যাডার সিস্টেমের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। Administrative Service and Reorganization Committee ASRC ১৯৭৩ সালে কমিটির মাধ্যমে প্রাথমিক

ভাবে এ দায়িত্ব সম্পন্ন করা হয়। রশিদ কমিশন ২৯ টি ক্যাডার এর সুপারিশ করেন। রশিদ কমিমনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৬ টি প্রধান ও আরো ২২ টি উপ-ক্যাডার প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে উপ-ক্যাডার বিলুপ্ত করা হয় এবং ক্যাডারের সংখ্যা দাড়ায় ৩০ টি তে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে বিসিএস প্রশাসন ও সচিবালয়কে একত্রিত করা হয়। ফলে ক্যাডার ২৯ টি এবং বাংলাদেশ চাকুরি ব্যবস্থার নাম রাখা হয় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস। পরবর্তিতে বিসিএস (জুডিসিয়াল) কে জুডিসিয়াল সিভিল সার্ভিস-এ রুপান্তরিত করা হয়।[৯] এর ফলে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এ মোট ২৮ টি ক্যাডার বিদ্যমান।

টেবিল ২- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর ক্যাডার তালিকা

০১	বিসিএস (প্রশাসন)
০২	বিসিএস (পররাষ্ট্র)
০৩	বিসিএস (পুলিশ)
০৪	বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)
০৫	বিসিএস (আনসার)
০৬	বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী)
০৭	বিসিএস (সমবায়)
০৮	বিসিএস (খাদ্য)
০৯	বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)
১০	বিসিএস (ডাক)
১১	বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহণ ও বাণিজ্যিক)
১২	বিসিএস (কর)
১৩	বিসিএস (বানিজ্য)
১৪	বিসিএস (ইকোনোমিক)
১৫	বিসিএস (তথ্য)
প্রফেশনাল/ টেকনিক্যাল ক্যাডার সমূহ	
১৬	বিসিএস (কৃষি)
১৭	বিসিএস (মৎস্য)
১৮	বিসিএস (খাদ্য)
১৯	বিসিএস (স্বাস্থ্য)
২০	বিসিএস (প্রাণীজ সম্পদ)
২১	বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)
২২	বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল)
২৩	বিসিএস (জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল)
২৪	বিসিএস (গণপূর্ত)
২৫	বিসিএস (পরিসংখ্যান)
২৬	বিসিএস (টেলিযোগাযোগ)
২৭	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
২৮	বিসিএস (বন)

[৯] মাসুদা কামাল (২০০৯), বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন: কতিপয় প্রসঙ্গ, অসডার পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় চার : মানব সম্পদ উন্নয়ন

৪.১-মানব সম্পদ উন্নয়ন

উন্নয়ন চিন্তার সর্বশেষ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো- মানব সম্পদ উন্নয়ন। ১৯৯০-এর দশকে এই ধারনার বিকাশ ঘটে। বর্তমানে উন্নয়ন চিন্তার ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণাটি বিবেচিত হচ্ছে সর্বাগ্রে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলি আর সামাজিক, সংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক উন্নয়নই বলি, সকল উন্নয়নের মূল কেন্দ্র বিন্দু মানব সন্তান। মানুষকে ঘিরে মানুষের জন্যই সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা।

সাধারণ কথায় মানব সম্পদ উন্নয়নকে বলা হয় People Centred Development। অর্থাৎ উন্নয়ন ব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণ মানব কেন্দ্রিক; মানুষ নিজেরা নিজেদের দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক উন্নয়ন ঘটাবে এবং নিজেরাই তার ফল ভোগ করবে।

তবে Leonard Nobler মানব সম্পদ উন্নয়নকে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেখেছেন যা Job Performance বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। তার ভাষায়...

"*Human Resource Development (HRD) as organized learning experiences in a definite time Period to incerease the possibility of improving job Performance growth*." [১০] অর্থাৎ মানব সম্পদ উন্নয়ন হলো কর্ম কৃতিত্ব উন্নয়ন বৃদ্ধির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংগঠিত শিক্ষা অভিজ্ঞতা।

[১০] Rafiqul Islam, Human Resource Development in Rural Development in Bangladesh, NILG, Dhaka-1990, p-70.

United Nations Industrial Development Organization এর মতে মানব সম্পদ উন্নয়ন হলো, "*The systematic development of man as subject and object to national development which includes all economic and industrial aspects, such as the Upgrading of Personal abilities and fostering leadership functions through education, training and research*"[১১] অর্থাৎ এখানে মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে মানুষের সংগঠিত উন্নয়নকে বুঝানো হয়েছে। যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন। এটি সকল অর্থনৈতিক ও শিল্প সংক্রান্ত দিক যেমন ব্যক্তিগত ক্ষমতার উন্নয়ন, উৎপাদন ক্ষমতা, সৃজনশীল ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার মাধ্যমে নেতৃত্বের কার্যাবলী অনুশীলনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আবার **Food and Agricultural Organization (FAO)** এর মতে "*HRD is the broadening Process for possibilities in the effective participation in the rural development including increase a productive capacities*". অর্থাৎ মানব সম্পদ উন্নয়ন হলো উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি সহ পল্লী উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাবনা সমূহের বিস্তৃত করার একটি প্রক্রিয়া।

মানব সম্পদ উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় H.L Verma এবং M.C.George এর 'Human Resource in India গ্রন্থে। তারা বলেন- Human resource development has been defined as the process of increasing the knowledge, skills and the capacities of people in society. **অর্থাৎ সমাজস্থ মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা এবং অন্যান্য ক্ষমতা বৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া হিসেবে মানব সম্পদ উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।**

[১১] Ibid, Rafiqul Islam, p-72

Dhaka University Institutional Repository

Kelly (2001) বলেন-

Human Resource Development can be defined simply as developing the most important section of any business its human resource by, "attaining or upgrading the skill and attitudes of employees at all levels in order to maximize the effectiveness of the enterprise".[১২]

In economic terms it means accumulation of human capital and its instrumental for the development of an economy.

ড. অর্মত্য সেন মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেন, "জনসাধারণের সক্ষমতার বিকাশ সাধনই হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো এই সক্ষমতা অর্জন এবং নিজের জীবনের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা।"

অর্মত্য সেনের বক্তব্যের সুত্র ধরে বলা যায়, মানব সম্পদ উন্নয়ন হলো মানুষের সুপ্ত সহজাত (Inherit) প্রতিভা ও তার কর্মক্ষমতার বিকাশ সাধন যা তাকে স্বনির্ভরভাবে বেঁচে থাকার পাশাপাশি বিশ্ব সভ্যতার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম করে তোলে।

বস্তুত উন্নয়ন চিন্তার পালাবদলে আধুনিক সময়ের মানুষের জন্য উন্নয়নের জন্য উন্নয়নের পরিবর্তে মানুষকে উন্নয়নের যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তাই মানব সম্পদ উন্নয়ন (ইসলাম,

[১২] Kelly D. (2001), Dual Perspective of HRD:Issues for Policy:SME's, Other Constituencies, and the Contested Definition of Human Resource Development, http/ro.uow.edu.au/artspaper/26

২০১০:১২৪)। এ মতবাদে উন্নয়ন যেমন মানুষের জন্য তেমনি উন্নয়নের মাধ্যমও মানুষ বলে মনে করা হয়।

বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায়- যে জাতি মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যতবেশী সক্ষম হয়েছে তাদের উন্নয়ন ও ততটাই ত্বরান্বিত হয়েছে। অন্যদিকে যে দেশগুলো মানব সম্পদ উন্নয়নের দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও পিছিয়ে রয়েছে।

৪.২-মানব সম্পদ উন্নয়নের উপাদান

মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রত্যয়টি বহু ধারায় প্রসারিত। মানুষের রয়েছে বহুমুখী প্রতিভা, পাশাপাশি রয়েছে নানামুখী প্রয়োজন। মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে গিয়ে একদিকে যেমন প্রয়োজনগুলো পরিপূরণের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হয়। অন্যদিকে তেমনি তার বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, তবেই সম্ভব হয় মানব সম্পদ উন্নয়ন। যাই হোক, নিচে সংক্ষেপে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদান তুলে ধরা হলো-

ক. শিক্ষা উন্নয়নঃ

শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের মৌলিক উপাদান। জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং মানসিকতার উন্নয়ন ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষা মানুষকে যেমন কর্মক্ষম করে তেমনি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জনের জন্য যে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন শিক্ষা তার ভিত্তি স্থাপন করে দেয়। শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে, বিবেক জাগ্রত করে, নিজের মত করে নিজেকে গড়ে তুলতে প্রেরণা যোগায়, সমাজ ও সভ্যতার প্রতি অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. প্রশিক্ষণ উন্নয়নঃ

মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রশিক্ষণ। বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ছাড়া দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয় না। যে জন্য পেশাগত ক্ষেত্রে শুধু শিক্ষাই নয় বরং শিক্ষার পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়।

গ. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নঃ

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এটি শুধুই প্রবাদ নয়। স্বাস্থ্যের সাথে কর্মদক্ষতা কর্মচাঞ্চল্য এবং মানসিকতার একটি বড় ধরনের যোগসূত্র রয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অপরিহার্য। মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে গিয়ে স্বাস্থ্যগত দিককে তাই বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হয়।

ঘ. বিনোদন উন্নয়নঃ

জীবনের জন্য সুস্থ বিনোদন অপরিহার্য। আমাদের কর্মচাঞ্চল্য বজায় রাখার জন্য বিনোদন অপরিহার্য। এক ঘেয়েমী দূর করে জীবনে কর্ম উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং মানসিক বিকাশ অব্যাহত রাখতে আজীবন বিনোদন প্রয়োজন।

ঙ. অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার মুল চালিকা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে অর্থনীতি। উন্নয়নের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলে মানব সম্পদ উন্নয়নের পথ ত্বরান্বিত হবে সন্দেহ নেই।

চ. পরিবেশ উন্নয়নঃ

মানুষের আধার হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ। পরিবেশই মানব সন্তানের সর্বাধিক মৌলিক চাহিদার সকল উপকরণ সরবরাহ করে। পরিবেশের এই অবদান নিশ্চিতভাবে অব্যাহত রাখতে হলে পরিবেশের বিরোধী কিছু করা যাবেনা।

ছ. বুদ্ধি বৃত্তি উন্নয়নঃ

বুদ্ধি বৃত্তি অবশ্যই শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত বিষয়। সাধারনত যারা জ্ঞান চর্চা ও অনুশীলন করেন তাদের এ প্রবৃত্তিকে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিশেষ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৪.৩-সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

সামগ্রীকভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কোন সংগঠনের মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিরাজমান। সংগঠনের কার্য সম্পাদন, দায়িত্ব পালন সর্বপরি সাংগঠনিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সংগঠনকে কর্মীবর্গ তথা মানব সম্পদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। আর এ জন্য মানব সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ধাপে ধাপে নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া অনুসরন করতে হয়।

৪.৪-সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়নের ধাপঃ

সংগঠনের মানব সম্পদ উন্নয়নের ধাপগুলিকে প্রধান চার ভাগে ভাগ করা যায়।

- ❖ স্টাফিং বা কর্মী সংস্থান
- ❖ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন
- ❖ প্রেষণা দান ও ক্ষমতায়ন
- ❖ সংরক্ষন বা রক্ষণাবেক্ষণ

ক. কর্মীসংস্থান (Staffing)ঃ

কর্মীসংস্থান হলো সংগঠন কাঠামোতে প্রদত্ত পদগুলো পূরণ করার ব্যবস্থা করা। এ কাজ সাধারণত কর্মীর প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ, কর্মীসংগ্রহ, নির্বাচন ও স্থাপনের মাধ্যমে করা হয়। নিচে কর্মীসংস্থানের আওতাভুক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হলোঃ

১। কার্য বিশ্লেষণ (Job Analysis)ঃ

কার্য বিশ্লেষণ কার্য সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্যসমূহ সংগ্রহের রীতিবদ্ধ পদ্ধতি। এর মাধ্যমে একটি পদের দায়িত্ব, কর্তব্য, কাজের প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও যন্ত্রপাতির তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া কার্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, সামর্থ্য ও গুণাবলী সম্বন্ধেও জানা যায়। কার্য বিশ্লেষণ সঠিক কর্মী নিয়োগ, কার্য সম্পাদন মূল্যায়ন ও মজুরি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২। মানব সম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning)ঃ

মানব সম্পদ পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যতে একটি সংগঠনের জন্য মানব সম্পদের চাহিদা নিরূপণ করার প্রক্রিয়া। যে কোন কাজ সম্পাদন করতে হলে সেখানে কি ধরনের কতজন শ্রমিক, কর্মী, ব্যবস্থাপক বা নির্বাহীর প্রয়োজন হবে, তাদের কি কি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন এবং কখন ও কিভাবে তা সংগ্রহ করা হবে তা পূর্বাহ্নেই স্থির করাটাই মানব সম্পদ পরিকল্পনা।

৩। কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন (Recruitment and Selection)ঃ

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপক কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। কর্মী সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠনের শূন্যপদ পূরনের জন্য যোগ্য কর্মীদের চাকরি প্রার্থী হতে আকর্ষণ করা হয়। অতঃপর পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগৃহীত ব্যক্তিদের মধ্যে হতে যোগ্যতমদের নির্বাচন করা হয়।

৪। নির্দেশনা ও স্থাপনা (Guidance and Placement)ঃ

এ ক্ষেত্রে কর্মীদের ঝোঁক, আগ্রহ, প্রবণতা ও যোগ্যতা বিচার করে সঠিক কর্মীদের সঠিক স্থানে স্থাপন করা হয়। এ জন্য অনেক সময় কাউন্সেলরের সহায়তা নেয়া হয়। সঠিক স্থানে সঠিক কর্মী নিয়োগ করার উপর প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন ও জনসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

খ. প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবহার (Training Development and Utilization)ঃ

কর্মীদের যত ভালভাবেই নির্বাচন করা হোক না কেন তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। নিচে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের কাজগুলো আলোচনা করা হলোঃ

৫। কর্মী পরিচিতিকরণ ও সামাজিকীকরণ (Induction and Socialization)ঃ

নতুন কর্মীদের সংগঠনের পরিবেশ, রীতিনীতি, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর সাথে পরিচিত ও অভিযোজনের কাজ পরিচিতিকরণ ও সামাজিকীকরণের আওতাভুক্ত। এতে কর্মীরা সহজেই সংগঠনের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়।

৬। প্রশিক্ষণ (Training)ঃ

কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে প্রশিক্ষণ বলে। এর মাধ্যমে কর্মীদের কার্য দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।

৭। উন্নয়ন (Development)ঃ

ব্যবস্থাপক ও পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তাকে উন্নয়ন বলে। সঠিক কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের কার্যদক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহন ক্ষমতা, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা ও সমস্যা মোকাবিলার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।

৮। পেশা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন (Career Planning and Development)ঃ

পেশা পরিকল্পনা ও উন্নয়নে কর্মীদের যোগ্যতা এবং ঝোঁকের উপর নির্ভর করে স্থাপন করা হয় এবং সংগঠনে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা হয়। এতে কর্মী ও সংগঠন উভয়ই লাভবান হয়।

৯। সাংগঠনিক উন্নয়ন (Organizational Development)ঃ

সাংগঠনিক সমস্যা সমাধান ও পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সংগঠনকে খাপ খাওয়ানোর সামর্থ্য উন্নয়নই হলো সাংগঠনিক উন্নয়ন। সাংগঠনিক উন্নয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপক সংগঠনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

গ. প্রেষণা দান ও ক্ষমতায়ন (Motivation and Empowerment)ঃ

কর্মীর কর্ম সম্পাদন প্রেষণা, যোগ্যতা ও কার্য পরিবেশের উপর নির্ভর করে। প্রেষণা কর্মীর কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি করে, প্রতিশ্রুতিশীল হতে সহায়তা করে এবং ক্ষমতায়নের পথ সুগম করে। নিচে প্রেষণা দানের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলোঃ

১০। সংগঠন ডিজাইন (Organization Design)ঃ

সাংগঠনিক ডিজাইনের মাধ্যমে সংগঠনের সার্বিক কাঠামোগত উপাদান ও এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারন করা হয়। এর মাধ্যমে সংগঠন স্ট্রাটেজি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।

১১। প্রেষণা ও কর্মসন্তুষ্টি (Motivation and Job Satisfaction)ঃ

প্রেষণা কর্মীদের নির্দিষ্ট আচরণের শক্তি যোগায় এবং কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। কর্ম সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে সংগঠনে কাজের প্রতি কর্মীদের ইতিবাচক মনোভাব গঠন করা হয়।

১২। বেতন ও মজুরি প্রদান (Payment of Salary and wages)ঃ

কাজের বিনিময়ে কর্মীরা মজুরি প্রত্যাশা করে। এ মজুরি অবশ্যই কর্মানুপাতিক এবং প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের সমানুপাতিক হতে হবে। একটি ভাল মজুরি প্রশাসন দক্ষ কর্মী আকর্ষণ ও সংরক্ষনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

১৩। কর্মীদের সুবিধাদি (Employee Benefits)ঃ

কর্মীরা নানাবিধ সুবিধাদি আশা করে। উৎসবভাতা, উৎপাদন বোনাস, চিকিৎসা সুবিধা, খেলাধুলার ব্যবস্থা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, অবসর ভাতা, চিত্ত বিনোদন প্রভৃতি। এ সকল সুবিধাদি কর্মীদের কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে।

১৪। কর্মীদের মধ্যে অঙ্গীকার সৃষ্টি (Build up Employee Commitment)ঃ

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে আনুগত্য সৃষ্টির পরিবর্তে অঙ্গীকার সৃষ্টির উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। কাজের সঠিক নীতিমালা, পদোন্নতির সুযোগ, নিরাপত্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ,

ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ কর্মীদের মধ্যে অঙ্গীকার সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সংগঠনের প্রতি কর্মীদের দৃঢ় অঙ্গীকার সৃষ্টি হলে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত বা মর্যাদাশীল মনে করে এবং আত্মপ্রণোদিত হয়ে কাজ সম্পাদনে আগ্রহী হয়। ফলে কর্মীর মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনতা বৃদ্ধি পায়।

ঘ. সংরক্ষণ ও ধরে রাখার ব্যবস্থাকরণ (Maintenance and Retention)ঃ

সংগঠনে কর্মীদের সংরক্ষণের মাধ্যমে ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথা শ্রম ঘূর্ণায়মানতা বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে, ব্যয় ও অপচয় বৃদ্ধি পাবে। নিচে কর্মীদের সংরক্ষণের কাজগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১৫। নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (Safety and Health)ঃ

কর্মীদের কাজ করার জন্য নিরাপত্তা, ঝুঁকি হ্রাস ও দুর্ঘটনার প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য নিরাপত্তার নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতে হয়। কর্মীদের স্বাস্থ্য রক্ষায় ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করাও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপকের কাজ।

১৬। শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক (Labour Management Relations)ঃ

শিল্প শান্তি বজায় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উত্তম শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক অপরিহার্য। কর্মী মনোভাব অনুধাবন, শ্রম আইনের সঠিক প্রয়োগ, সুষ্ঠু মজুরি কাঠামো নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পশান্তি বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৭। সুষ্ঠু যোগাযোগ (Communication)ঃ

যোগাযোগের বাধার কারণেই আন্তঃব্যক্তিক ও আন্তঃদলীয় সমস্যা সৃষ্টি হয়। সঠিক ও সুষ্ঠু যোগাযোগ কর্মী, তত্ত্বাবধায়ক ও সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার হাতিয়ার। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপক যোগাযোগের বাধাগুলো নির্ণয় ও দূর করার ব্যবস্থা করেন।

১৮। কাউন্সেলিং (Counselling)ঃ

শারীরিক সুস্থতার মত মানসিক সুস্থতা ও অত্যাবশ্যক। শিল্প কারখানার শ্রমিকদের আবেগজনিত সমস্যা বিরূপ মনোভাব ও হতাশা বৃদ্ধি করে। কাউন্সেলিং কর্মীদের আবেগজনিত সমস্যার সমাধান পূর্বক কাজে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় পাঁচ : বাংলাদেশের সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন

সরকারী সংগঠন এর ব্যাপকতা বিরাট। গবেষণার সুবিধার্থে এই গবেষণাতে আমি বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) এর মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মানব সম্পদ উন্নয়ন এর উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সেগুলোর ফলাফল এবং সেগুলোর ত্রুটিযুক্ত দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

বাংলাদেশের সরকারি সংগঠন সমূহের বিশেষ করে সিভিল সার্ভিসের মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে করা হল।

৫.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ঃ

প্রজাতন্ত্রের গণকর্মচারী নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। এ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য গণকর্মচারী নিয়োগ বিধি ও চাকরি বিধি প্রণয়ন ও এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধিনে ১৯৬২ সালে "সাধারণ প্রশাসনিক শাখা (General Administrative wing)" হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কার্যক্রম শুরু করে। স্বাধীনতার পরে এর নতুন নাম করা হয় সংস্থাপন বিভাগ ১৯৮২ সালে পূণর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। তখন এর নাম হয় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। সময়ের আবর্তনে কার্য সম্পৃক্ত নামকরণের চাহিদা অনুভূত হওয়ায় পরবর্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে ২৮ এপ্রিল ২০১১ সালে এ মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নামে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তিতে চাহিদার নিরীখে

কার্যপরিধিরও ১৫ এপ্রিল ২০১২ তারিখে পরিবর্তন আনা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ম্যানডেট হচ্ছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনস্থ কর্মী ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন।

৫.১.১-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কাঠামোঃ

ক. প্রশাসন অনুবিভাগ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর অধীনে ৪ টি শাখা, সচিবালয় গ্রন্থাগার, হিসাব কোষ গ্রহণ ও বিতরণ ইউনিট এবং সচিবালয় মহাফেজখানার সমন্বয়ে প্রশাসন অনুবিভাগের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

খ. নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ (এ.পি. ডি) অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগ নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ অনুবিভাগ নামে পরিচিত। একজন যুগ্মসচিবের অধীনে নবনিয়োগ ও বৈদেশিক নিয়োগ অধিশাখা, মাঠ প্রশাসন অধিশাখা ও উর্ধ্বতন নিয়োগ অধিশাখা নিয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত। নবনিয়োগ ও বৈদেশিক নিয়োগ অধিশাখার আওতায় ২ টি শাখা, মাঠ প্রশাসন অধিশাখার আওতায় ৫ টি শাখা ও উর্ধ্বতন নিয়োগ অধিশাখার আওতায় ৪ টি শাখা রয়েছে। এ অনুবিভাগে ৭ জন উপসচিব এবং ৭ জন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্মে নিয়োজিত আছেন।

গ. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে একজন অতিরিক্ত সচিবের অধীনে বর্তমানে ৪ টি অধিশাখা এবং ১৪ টি শাখা রয়েছে। এ অনুবিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীন বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের জন্য অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে পদসৃজন ও বিভাজন করে থাকে।

তাছাড়া সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্বখাতে পদ স্থানান্তর, পদ স্থায়ীকরণ, টি.ও এন্ড ই অনুমোদন এবং সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করে।

ঘ. ক্যারিয়ার প্লানিং ও ট্রেনিং (সি.পিটি) অনুবিভাগ

একজন যুগ্মসচিবের অধীনে ৩ জন উপসচিব, ১ জন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ৬ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ২ জন সিস্টেম এনালিস্ট, ২ জন প্রেগ্রামার, ৮ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ১ জন সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এর সহযোগিতায় এ অনুবিভাগের কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

ঙ. বিধি অনুবিভাগ

২ জন যুগ্মসচিবের অধীনে ২ জন উপসচিব এবং ৩ জন সিনিয়র সহকারী সচিব কর্মরত আছেন। এ অনুবিভাগ সকল সরকারি ও বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, নিয়োগের বয়সসীমা, জ্যেষ্ঠতা, শৃঙ্খলা, অবসর এবং এ সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন করে। এছাড়া আইন ও বিধি প্রবিধিমালা প্রণয়ন, সংশোধন, সংযোজন ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়গুলোতে পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি পদেরনাম পরিবর্তন, পদের মান উন্নীতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করে থাকে।

চ. সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগ

একজন অতিরিক্ত সচিবের অধীনে ২ জন উপসচিব, ৪ জন সিনিয়র সহকারী সচিব ও ৪ জন অনুবাদ কর্মকর্তা এ বিভাগে কর্মরত। পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ এবং বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ নামে দু'টি কোষ নিয়ে একটি নবসৃষ্ট অনুবিভাগ গঠিত।

ছ. শৃঙ্খলা অনুবিভাগ

একজন যুগ্মসচিবের নিয়ন্ত্রণে ২ টি শৃঙ্খলা অধিশাখার অধীনে ৫ টি শাখা, ২ টি তদন্ত অধিশাখা এবং আইন কোষের অধীনে ২ টি অধিশাখা ও ৩ টি শাখা নিয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত।

জ. উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও বার্ষিক অনুবেদন (সি.আর.) অনুবিভাগ

একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ২ জন যুগ্মসচিব, ২ জন উপসচিব, ৩ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ২ জন সহকারী প্রধান ও ১ জন গবেষণা কর্মকর্তার মাধ্যমে এ অনুবিভাগের কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে।

৫.১.২-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যবলী

১৯৭৫ সালের সরকারী কার্যবিধি অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করা হয়েছে । জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী ও দায়িত্বকে আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নলিখিত ৬ টি ভাগে আলোচনা করা হলো।

১.কর্মী নিয়ন্ত্রণ (Personnel regulation)

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কর্মচারী বিধিসমূহের (অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিষয়গুলো ছাড়া) চাকুরীর সাধরণ বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করা। কর্মচারী বিধি নিম্নের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করেঃ

ক. প্রাসঙ্গিক সাংবিধানিক শর্তাবলী।

খ. সাংবিধানিক শর্তাবলীর সাথে অসংগতিপূর্ণ নয় এমন বিষয়াবলী।

গ. প্রশাসনের একটি কার্যগত উপযোগিতা নিশ্চিত করতে নির্বাহীর দ্বারা প্রণীত নিয়ম কানুন।

প্রকৃত পক্ষে সংবিধানই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে সময়ে সময়ে চাকুরী বিষয়ক প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়নের সুযোগ করে দিয়েছে।

২. নিয়োগ

যদিও সকল গেজেটেড কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা পরিচালনা করা সরকারী কর্মকমিশনের দায়িত্ব তথাপিও নিয়োগের মৌলিক নীতিমালা প্রণয়নের প্রাথমিক দায়িত্ব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। সংবিধানিক বিধি বিধানের সাথে সংগতি রেখে সরকারী কর্মকমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নিয়োগের জন্য যোগ্যতা ও বয়সসীমা নির্ধারন করে। এই মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে কর্মকমিশন পরীক্ষা গ্রহণ এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রেরণ করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যোগ্য প্রার্থীদের চাকুরীতে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে আদায় করে তাদেরকে চাকুরীতে নিয়োগ দান করে।

৩. প্রশিক্ষণ

সরকারী কার্যবিধি সূচী-১ অনুসারে কর্মকর্তা কর্মচারীদের দেশের অভ্যন্তরে বাহিরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাধারণ দায়িত্বের অংশ বিশেষ। বর্তমানের লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দানের সাথে জড়িত। এ প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে তার নির্দেশানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালনা করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ ধরনের প্রশিক্ষণ ছাড়াও সরকারী চাকুরীজীবিদের জন্য কার্যসম্বন্ধীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব এবং চাকুরীকালীন সময়ে প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. নিয়মমাফিক কর্ম প্রশাসন (Routine Personnel Administration)

ক. নিয়োগদান, বদলী ও ডেপুটেশনে নিয়োগ (Posting, Transfer & Deputation)

সরকারী চাকুরীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রবেশের পর মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে নিয়োগদান ও বদলীর ক্ষেত্রে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করে কিন্তু এক মন্ত্রণালয় থেকে অন্য মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান ও বদলীর দায়িত্ব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যাস্ত। বিভিন্ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং ডিরেক্টরদের নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং সরকারী কর্মকর্তাদের ডেপুটেশনে প্রেরনের দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয় পালন করে থাকে।

খ. বেতন, পেনশণ ও ছুটি (Salary, Pension and Leave)

বেতন, পেনশন ও ছুটির ক্ষেত্রে স্ব-স্ব বিভাগ দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেও এ ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র নিতে হয়। ছুটির নিয়মনীতি প্রণয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

গ. কর্মফল মূল্যায়ন

সরকারী চাকুরীজীবীদের কর্মফলমূল্যায়নের ক্ষেত্রে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন তৈরিতেও এ মন্ত্রণালয় বিরাট ভূমিকা পালন করে। এসব গোপনীয় প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি, বদলীর জন্য সুপারিশ আকারে ব্যবহৃত হয়।

ঘ. পদন্নোতি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উচ্চতর শূণ্যপদের পর্যাপ্ততা দেখে চাকুরীজীবদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পদন্নোতির ব্যবস্থা করেন।

ঙ. শৃংখলা

সরকারী কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন বিষয় শৃংখলার পরিপন্থি তা সরকারী চাকুরীজীবি শৃংখলা ও আপিল বিধি ১৯৮৫ এ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এই বিধি অনুসারে সরকারী কর্মকর্তা দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হলে কারণ অনুযায়ী দু ধরনের শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত রয়েছে-

ক. লঘুদন্ড ঃ তিরস্কার, নিন্দা, বেতন বৃদ্ধি ও পদন্নোতি স্থগিত।

খ. গুরুদন্ড ঃ নিম্নপদে নামিয়ে দেয়া, বাধ্যতামূলক অবসর, অপসারণ চাকুরীচ্যুতি ইত্যাদি।

৬. সংগঠন ও পদ্ধতি (Organization & Method)

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এ শাখাটি সাবেক পাকিস্তান আমলে গঠিত হয়েছিল। এর লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন সরকারী দপ্তর, কর্পোরেশন, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। কাজেই এ কথা অনস্বীকার্য, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্মী সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সরকারী কর্মচারীদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সংরক্ষণ করে, ACR সংরক্ষণ ও পর্যালোচনা করা, Career development, কর্মী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান, কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর নাগরিকের জন্য চাকুরীর কোটা সংরক্ষণকরা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে।

৫.১.৩-মানব সম্পদ উন্নয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতাঃ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় কর্মচারী সংস্থা হিসাবে কর্মচারী ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের কাজে নিয়োজিত, তবে কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে এ সংস্থার বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

প্রথমতঃ কর্মচারী ব্যবস্থাপনার যে ধরণ তা ঐপনিবেশিক আমলে গড়ে উঠেছে। স্বাধীন দেশের আশা আকাংখার সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সরকারী কর্মকাঠামো এবং কর্মচারী ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেনি। এমনকি বিশাল সংখ্যক কর্মচারীবৃন্দ সরকারী কাজে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কোন (Personnel Policy) কর্মচারী নীতি তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৩ সালে ASRC থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যতগুলো প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়েছে এদের প্রায় সবকটি Personnel Policy এর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তা তৈরী করা সম্ভবপর হয়নি। ফলে সুনির্দিষ্ট Personnel Policy ছাড়া কর্মচারী প্রশাসন চালাতে গেলে বিভিন্ন ধরনের ব্যর্থতা এমন কি দুর্নীতির উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মতই রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে এখনও সুস্থ মন্ত্রী-সচিব সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। কার্যত: রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মন্ত্রণালয়ের কার্যরত আমলারা জবাবদিহিতা মুক্ত থেকে কাজ কর্ম চালিয়ে যেতে পারে। এ কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মচারীদের বদলি ও পদন্নোতির ক্ষেত্রে অনেক অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে,

ক. পদন্নোতি ও বদলির ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতাকে মূল্যায়ন করা হয় না। প্রায়ই অভিযোগ ওঠে যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং কাজের উত্তম কর্মদক্ষতা ছাড়াই অনেক কর্মকর্তা পদন্নোতি পেয়েছেন।

খ. কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তি হিসাবে ACR বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন অনেক ক্ষেত্রেই বস্তুনিষ্ঠভাবে তৈরী করা হয় না।

গ. প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপন ও প্রকৃত কর্মচারী চিহ্নিত করণের কোন নিয়মনীতি না থাকার কারণে এক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরন লক্ষ্য করা যায়। এ নিয়ে কর্মচারীদের ভিতর অনেক অসন্তোষও বিদ্যমান রয়েছে।

ঘ. শৃংখলা বিধানের ক্ষেত্রেও দূর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। দুর্নীতির সাথে জড়িত এমন কিছু কর্মকর্তাও রয়েছেন যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গ্রহণ করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত ঃ কেন্দ্রীয় কর্মচারী সংস্থা হিসাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মক্ষেত্র হচ্ছে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা। গোটা প্রশাসন ব্যবস্থার কাঠামো নীতিমালা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে যা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কাজে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে থাকে। যেমন মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে একইরূপ আচরণের নিশ্চয়তা বিধান করা বাস্তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা।

তৃতীয়ত ঃ সরকারী কর্মচারীদের রাজনৈতিক ভূমিকা দিয়েও কখনো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড প্রভাবিত হয়ে থাকে। অতীতে এমনও দেখা গেছে সরকারী কোন কোন আমলা কর্মকর্তাকে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে পদোন্নতি দিতে বাধ্য হয়েছে।

চতুর্থত ঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটি কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে।এ দুর্বলতাটি সরকারী কর্মকমিশন ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কের মধ্যে নিহিত । পূর্বেই বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় কর্মচারী সংস্থার সার্বিক দায়িত্ব যৌথভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সরকারি কর্মকমিশন (PSC)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সরকারের একটি কর্মবিভাগ যা কার্য সম্পন্নের জন্য সরকার কর্তৃক সৃষ্ট। অন্যদিকে কর্মকমিশন সাংবিধানিক সংস্থা, বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭ ধারা বলে সৃষ্ট। এর চেয়ারম্যান এবং মেম্বারগণ সংবিধানের বিধি বিধানের আওতায় নিয়োগ

প্রাপ্ত হন। যদিও এরা উপদেশমূলক ভূমিকা পালন করে থাকেন। এ সংস্থার দায়িত্ব হচ্ছেঃ

ক. নিয়োগঃ সাংবিধানিক বিধি বিধানের সাথে সংগতি রেখে PSC-এর সাথে পরামর্শ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নিয়োগের জন্য যোগ্যতা, বয়সসীমা ইত্যাদি নির্ধারণ করে থাকে। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে PSC প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করে এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যোগ্য প্রার্থীদের চাকুরীতে নিয়োগ দানের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে আদায় করে।

খ. শংখলা ঃ এ বিষয়টি PSC করার কথা কিন্তু PSC -এর কোনরূপ উপদেশ পরামর্শ ছাড়াই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তা করে থাকে।

গ. পদন্নোতিও বদলি ঃ পদন্নোতি ও বদলীর ব্যাপারে PSC 'র সরাসরি কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু পদন্নোতির ব্যাপারে PSC-কে খর্ব করে রাখা হয়েছে। PSC-কোন সংযুক্ত দপ্তর নয়। এটি স্বনির্ভর সংস্থা-এর কিছু কার্যভার প্রাপ্ত ক্ষমতা (Mandatory Power) আছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ই এ বিষয়ে সর্বেসর্বা। PSC 'র কর্মসম্পাদনের জন্য রয়েছে PSC সেক্রেটারিয়েট এবং এর আঞ্চলিক অফিসসমূহ। আর এই PSC সেক্রেটারিয়েট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২: বাংলাদেশের সরকারি কর্ম কমিশন ঃ

সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা সংগ্রহ ও নির্বাচনের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের উপর। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশে এক বা একাধিক সরকারি কর্ম কমিশন থাকবে এবং কমিশন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে। আইন অনুযায়ী প্রথম দিকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত দু'টি কর্ম কমিশন ছিল। প্রথম কর্ম কমিশন ও দ্বিতীয় কর্ম কমিশন।

গঠন ঃ কর্ম কমিশন একজন সভাপতি ও কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত। কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

৫.২.১-কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩০ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে। এই কমিশনের ক্ষমতা তিন ধরনের প্রশাসনিক, আধা-বিচার সংক্রান্ত এবং নিয়ন্ত্রন মূলক। পরবর্তী ক্ষমতা দুটি উপদেষ্ঠামূলক ধরনের।

প্রশাসনিক ক্ষমতা ঃ

সকল বে-সামরিক সরকারি কর্মে নিয়োগের জন্য সরকারি কর্ম কমিশন যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষা পরিচালনা করে। এরূপ যোগ্যতা যাচায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের নিয়োগ বা নির্বাচন নীতি প্রণয়ন করে।

Dhaka University Institutional Repository

উপদেষ্টা মূলক ক্ষমতা ঃ

নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, চাকরির শর্ত, শৃঙ্খলামূলক কার্য ব্যবস্থা, অবসর ভাতা এবং কর্মচারী প্রশাসন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে এই কমিশনের উপদেষ্ঠামূলক দ্বায়িত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি চাকরি সংক্রান্ত কোন পরামর্শ চাইলে কমিশন রাষ্ট্রপতিকে সেসব বিষয়ে উপদেশ দেবে।

৫.২.২-কমিশনের কার্যাবলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর অনুচ্ছেদ-১৪০ এ কমিশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী বর্ণিত আছে, যা নিম্নরুপ-

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা;

(খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান; এবং

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সাহিত অসমঞ্জস্য নহে) বিধনাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন ঃ

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুসরনীয় নীতি সম্পর্কে;

(গ) অবসর-ভাতা অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি; এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষায়াদি।

৫.২.৩-বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ভুমিকার সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কতটুকু সার্থকভাবে তার ভুমিকা পালন করতে পারছে এ সম্পর্কে মূল্যায়ন বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাংবিধানিকভাবে BPSC'র কার্যক্রম, গঠন, স্বাধীন ও কার্যকরি রাখার চেষ্টা করা হলেও বাস্তবে তার বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। BPSC'র সার্বিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বাধীনতার পর থেকেই BPSC তার স্বাধীন সাংবিধানিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তার কর্মী বাছাই কার্যক্রমে বহুবার হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং কর্মী নিয়োগে বিধিবদ্ধ নিয়মকে উপেক্ষা করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব নিয়োগে BPSC'র ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা রয়েছে মন্ত্রীর। বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষা ছাড়া কর্মী নিয়োগ করে BPSC'র কাছে তা অনুমোদনের জন্য জোরালো সুপারিশের সংখ্যাও কম নয়। আবার BPSC'র অননুমোদিত ব্যক্তির নিয়োগের ঘটনাও এদেশে ঘটেছে। ফলে কর্মী বাছাইকরণে BPSC'র সাংবিধানিক কর্তৃত্ব এভাবেই ক্ষুন্ন হয়েছে। এই সার্বিক প্রেক্ষাপটে BPSC'র মৌলিক কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো হলো-

১. কাটামোগত অসুবিধা

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বর্তমান বিল্ডিং সুযোগ সুবিধা তার কার্যক্রমে বিশালতা ও ব্যাপকতার তুলনায় নগণ্য। এমনকি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিল্ডিং সুযোগ সুবিধা এর নেই।

২. কর্ম সম্পর্কিত জটিলতা

স্বাধীনতার পর থেকে BPSC'র কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে, জটিলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে । গুরুত্ব বেড়েছে কিন্তু সেই অনুপাতে অফিসার ও স্টাফ বাড়েনি।

৩. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আধিপত্য

সংগঠন, প্রশাসন ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির দিক থেকে BPSC'র উপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রাধান্য স্বীকৃত। BPSC'র বাজেট নিয়ন্ত্রণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। সরকার ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে BPSC'র সম্পর্ক কার্যক্রম নির্দেশিত হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। সুতরাং BPSC'র সাংবিধানিক স্বাধীনতার বিষয় এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. সভাপতি ও সদস্যের অপসারণ

সংবিধান অনুযায়ী BPSC'র সভাপতি ও সদস্যের অপসারণের জন্য অসাদাচরণ, শারীরিক ও মানসিক অসঙ্গতি, রাষ্ট্রপতির নির্দেশ এবং প্রধান বিচারপতি সহ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র বিচারপতিদ্বয়ের নির্দেশের অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু প্রায়শই এই ধারা অনুসরণ করা হয় না।

৫. সাংবিধানিক ধারা অতিক্রম

অধ্যাদেশ নং ৫৭, ১৯৭৭ অনুযায়ী BPSC'র সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সামরিক সরকার ১৯৮২ সালে এই ধারাকে অতিক্রম করে MLCOS গঠন করে এবং তার সুপারিশে সদস্য সংখ্যা সংকুচিত করেন যা ছিলো সংবিধানের ১৩৮ ধারা বিরোধী।

৬. অস্থায়ী নিয়োগে অযৌক্তিকতা

স্বাধীনতার পর সব সরকারই প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগে অগ্রসর হয় এবং পরে তাদের স্থায়ী করে নেয়া হয়। বাংলাদেশে ১৯৮০ সালের আগ পর্যন্ত দেখা যায় মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো নিয়মবহির্ভূতভাবে নিজেদের খেয়ালখুশি মত অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করে। ফলে সার্ভিস কাঠামোতে বিশৃংখলা দেখা দেয়।

৭. পদন্নোতির মাধ্যমে নিয়োগে জটিলতা

নিম্নপদ থেকে প্রথম শ্রেণীর পদে পদন্নোতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ BPSC-কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করেনা। আবার যে Annual Confidential Report প্রদান করা হয় তাও নির্ভরযোগ্য নয়। ফলে সামগ্রিক কার্যক্রম হয় বিলম্বিত, জটিল এবং অনেকক্ষেত্রে অযোগ্যব্যক্তির ভাগ্যেই পদন্নোতির সৌভাগ্য অর্পিত হয়।

৮. কার্যক্রমের অসামঞ্জস্যতা

অনেক সময় নিয়োগ কর্তৃপক্ষ আকস্মিকভাবে ও অপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশে পাবলিক সার্ভিস কমিশন-কে নতুন কর্মী বাছাই এর অনুরোধ করে। BPSC কার্যক্রম শুরু করে এবং তখন আকস্মাৎ সেই কর্তৃপক্ষ BPSC-কে বাছাই কর্ম বন্ধের জন্য অনুরোধ জানায়। অনেক সময় BPSC বিজ্ঞাপন দিয়ে দেয় আবার বাছাই সম্পন্ন করেও ফেলে । এই ধরণের দ্বায়িত্বহীনতা, অমর্যাদা, জ্ঞানহীনতা BPSC'র কার্যক্রমকে প্রতিনিয়ত ব্যাহত করছে।

বস্তুত, সরকারি কর্মক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি নির্বাচনে সরকারি কর্মকমিশন কর্মী বাছায়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করলেও এর কার্যক্রম অনেকসময়ই সমালোচিত হয়ে থাকে। কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা মূলত রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ পান, এর কর্মকর্তারা অধিকাংশ সময়ই নিমজ্জিত থাকে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে, প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগেই ফাঁস হয়ে যাওয়া, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরদানে কারসাজি করে অযোগ্য প্রর্থীদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে[১৩]।

৫.৩: বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ

ঢাকার অদূরে সাভার শহরের রেডিও বাংলাদেশ ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী এলাকায় ৫৪.২ একর এলাকা জুড়ে মনোরম পরিবেশে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষনের জন্য বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[১৩] দৈনিক প্রথম আলো, শনিবার, ১০ মার্চ, ২০০৭।

সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মীর প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অধ্যাদেশে ১৯৮৪ (১৯৮৪ সালের ২৬ নং অধ্যাদেশ)- এর বলে ১৯৮৬ সালের ২৮ এপ্রিল, সাবেক বাংলাদেশের প্রশাসনিক ষ্টাফ কলেজ (বিএএসসি), জাতীয় লোক প্রশাসন প্রতিষ্ঠান (নিপা), সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (কোটা) কে একত্রিত করে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তী অধ্যায়ের প্রশিক্ষণ অংশে বিপিএটিসি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৪-বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন একাডেমী ঃ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডার এর কর্মকর্তাদের আইন ও প্রশাসনের উপর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৮৭ সালের ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত এবং এটি ঢাকা শহরের শাহবাগে অবস্থিত।

এই একাডেমীর নেতৃত্বে থাকেন প্রশাসনিক ক্যাডারের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যাকে রেক্টর বলা হয়, এবং তিনি সরকারের একজন সচিব পদধারী ব্যক্তি। এছাড়া তিনজন ডিরেক্টর থাকেন যারা সরকারের উপ-সচিব পদধারী।

একাডেমীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার এর কর্মকর্তাদের অপরাধ আইন, ভূমি আইন, নিয়মনীতি, লোক প্রশাসন, উন্নয়ন প্রশাসন, সুশাসন ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এছাড়া নবাগত কর্মকর্তাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং মৌলিক আইন সমূহ অধ্যায়নের যোগ্য করে গড়ে তোলা।

৫.৫-জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি ঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এই একাডেমির মূল উদ্দেশ্য হলো-

- পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- নবাগত বিসিএস (ইকোনোমিক) ক্যাডার অফিসারদের জন্য নিয়োগ বিধি অনুযায়ী শিক্ষানবিস সময়ে বুনিয়াদী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- অন্যান্য সংগঠন বা দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজন বোধে বিশেষ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা এজেন্সিকে পরামর্শ সেবা প্রদান বিশেষ করে কোন উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই, পর্যবেক্ষণ কিংবা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে।

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির মৌলিক কোর্স সমূহ নিম্নরুপ-

- Post graduate Diploma in development planning.
- Post graduate Diploma in ICT (PGDICT).
- English Language certificate course.
- Extensive ICT course.
- Extensive Project Management course.
- Extensive HRM course
- Extensive Office Management course.
- Extensive economic and development oriented course
- Departmental training courses of B.C.S (Economic) Cadre officers.

৫.৬-বাংলাদেশ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট ঃ

বাংলাদেশ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Institute of Administration and Management) সরকারি কর্মচারীদের উন্নয়ন, প্রশাসন এবং

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটির মিশন হলো বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের মানব সম্পদ উন্নয়ন আর সংস্থাটি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেমিনার, ওয়াকর্শপ ইত্যাদির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে এর মিশন অর্জনে সর্বদা সচেষ্ট। কম্পিউটার ব্যবস্থাপনা এবং কমিউনিকেটিভ ইংরেজীর উপরে সংস্থাটির রয়েছে কিছু নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স।

৫.৭-বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়াঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির মূল্যায়নে কার্যরত একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৯ সালে এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এ প্রতিষ্ঠান চাকরি-পূর্ব ও চাকরি কালীন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সেমিনার, অধিবেশন ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করাও এর দায়িত্ব।

পল্লীর প্রশাসন, পল্লীর অর্থনীতি, পল্লীর সমাজ জীবন, পল্লীর মানসিকতা ও যোগাযোগ, সমবায় ও পল্লী অঞ্চলের ব্যবসা পরিচালনা ও কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও মহিলাদের উন্নয়ণ প্রভৃতি বিষয়ে এই একাডেমিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পল্লী অঞ্চল ও পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে গবেষনা পরিচলিত হয় এই একাডেমিতে ।

উদ্দেশ্যসমূহ:

- গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে জরিপ ও গবেষণা পরিচালনা করা;
- মডেল সম্প্রসারণ কাজের পরিচালনা;
- গ্রামবাসীদের জন্য মডেল প্রশিক্ষণ কোর্সের পরিচালনা;
- গ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ‘প্রশিক্ষণ উপকরণ’ প্রস্তুত করা;

- কার্যকর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি গড়ে তোলা;
- পরীক্ষামূলক ছোটখাট প্রকল্প সংগঠন;
- একাডেমী পরিচালিত অঞ্চল ভিত্তিতে প্রকল্পের মূল্যায়ন।

৫.৮-বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র

শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে মধ্যম ও উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেছে। এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে তা স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থার মর্যাদা লাভ করে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি সরকার, শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এক গভর্নিং বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ কেন্দ্রের লক্ষ্য নিম্নরূপ:

- বিভিন্ন পর্যায়ে শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠনের পরিচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শ্রম ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুস্থ্য ও গঠনমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা দান;
- ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শ ও উপদেশ দান;
- গবেষক, বুদ্ধিজীবী, ও ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তিদের লেখা এবং গবেষণা প্রকাশ;
- একক বা যুগ্ম উদ্যোগে আলোচনা, সেমিনার, প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার আধুনিক ধারণার বিকাশ সাধন।

৫.৯-পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমি, সারদা, রাজশাহি

এই প্রতিষ্ঠান ১৯১২ সালে ব্রিটিশ-ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত হয়। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত বিসিএস (পুলিশ) সার্ভিসে নবনিযুক্ত এ.এস.পি, পুলিশ ইন্সপেক্টর, পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর, পুলিশ কনস্টেবল এমন কি আবগারি শুল্ক বিভাগের ডেপুটি সুপারইনটেন্ডেন্টস্ অব কাস্টমস্ প্রমুখকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান তিন ধরণের কোর্স পরিচালনা করে:

১. **মৌলিক কোর্স:** এই কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় নবনিযুক্ত এ.এস.পি, পুলিশ ইন্সপেক্টর, পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর, পুলিশ কনস্টেবলদের।

২. **সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খন্ডকালীন সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণ কোর্স:** এই কোর্সের আওতায় পড়ে আবগারি বিভাগের ডেপুটি সুপারইনটেন্ডেন্টস্, ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ ও সার্জেন্ট হেড কনস্টেবল।

৩. **চাকরিকালীন কোর্স:** এই কোর্স ডেপুটি পুলিশ সুপার, পুলিশ ইন্সপেক্টর ও সেকশন লিডারদের দেয়া হয়।

৫.১০-পুলিশ স্টাফ কলেজ, মিরপুর ঢাকা

পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশে একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান যা পুলিশ স্টাফ কলেজ আইন' ২০০২ এর মাধ্যমে পরিচালিত। সহকারী পুলিশ সুপার ও তদুর্ধ্ব পুলিশ কর্মকর্তাদের সমসাময়িক পুলিশিং, মানবাধিকার, ব্যবস্থা, জেন্ডার, কমিউনিটি পুলিশ, টেররিজম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও দেশী-বিদেশী উন্নয়ন অংশীদারগণের সহায়তায় ও অংশগ্রহণে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ ২০০০ সাল থেকে বিবিধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ছয় : সরকারি সংগঠনের মানব সম্পদ উন্নয়ন পদ্ধতি

বাংলাদেশের সরকারি সংগঠন বিশেষ করে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়- সেগুলো এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

৬.১-নিয়োগ ঃ

সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও শক্তিশালী সিভিল সার্ভিস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সু-লোকসংগ্রহ নীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক ও জটিল প্রশাসনিক কাজের জন্য দক্ষ ও কৃতি প্রশাসকের প্রয়োজন। এই দক্ষ ও কৃতি প্রশাসক নির্বাচন করার অন্যতম মাধ্যম হলো নিয়োগ।

বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের জন্য চাকুরি ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করেছে।

৬.১.১-বিসিএস এ নিয়োগের আইনি ভিত্তি ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ এ বর্ণিত আছে "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে"।

একই অনুচ্ছেদের ২নং ধারায় বর্ণিত আছে "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেনা কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবেনা।"

৬.১.২-সরকারি কর্ম কমিশনের ভূমিকা ঃ

মূলত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ১৯৮১-১৯৮২ সালের নিয়োগ আইনের আওতায় কর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। ধাপে ধাপে সরকারি কর্ম-কমিশন এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। ১৯৮২ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এই কমিশন ৩৪টি বিসিএস পরীক্ষা পরিচালনা করেছে।

৬.১.৩-বিসিএস নিয়োগ পদ্ধতি ঃ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নিয়োগ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের পর থেকে চূড়ান্ত নিয়োগ লাভ করতে প্রায় দুই থেকে তিন বছর লেগে যায়। বিসিএস নিয়োগ পদ্ধতির ধাপ গুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

ধাপ- ১ : প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ঃ

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হচ্ছে ১০০ নম্বরের বহু নির্বাচনী প্রশ্নের (MCQ) মাধ্যমে বাছাই পদ্ধতি যেখানে প্রশ্নগুলো বাংলা, ইংরেজী, সাধারণ জ্ঞান, (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী), গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা এবং দৈনন্দিন বিজ্ঞান এর উপর। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর প্রদান এবং দুইটি ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কর্তন করা হয়। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা উত্তীর্ণরাই লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

ধাপ- ২ : লিখিত পরীক্ষা ঃ

পূর্বে বিসিএস রিক্রুটমেন্ট রুল ১৯৮১ অনুযায়ী ১৬০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হতো। ১৯৮৪ সালে এটি কমিয়ে ৯০০ নম্বরের করা হয়।

টেবিল ৩-বিসিএস পরীক্ষার বর্তমান নম্বর বিন্যাস

সাধারণ ক্যাডার এর জন্য বিষয়	**নম্বর**	**প্রকৌশল/টেকনিক্যাল ক্যাডার**	**নম্বর**	**উভয় ক্যাডার এর জন্য**	**নম্বর**
বাংলা	২০০	বাংলা	১০০	বাংলা	২০০
ইংরেজি	২০০	ইংরেজি	২০০	ইংরেজি	২০০
বাংলাদেশ বিষয়াবলী	২০০	বাংলাদেশ বিষয়াবলী	২০০	বাংলাদেশ বিষয়াবলী	২০০
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী	১০০	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী	১০০	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী	১০০
গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০
দৈনিন্দিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০	পদ সংক্রান্ত দু'টি পত্র	২০০	দৈনিন্দিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
				পদ সংক্রান্ত দু'টি পত্র	২০০
মোট	৯০০	মোট	৯০০		১১০০

উৎস্য: SRO/75-Law/2005-Dated 29 March 2005; BPSC Report 2010

ধাপ- ৩ : মৌখিক পরীক্ষা ঃ

পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বলে বিবেচ্য হবে। মৌখিক পরীক্ষায় মোট নম্বর ২০০ এর মধ্য ৪০ শতাংশ নম্বর পেলে পাশ বলে বিবেচ্য হবে। মৌখিক পরীক্ষায় ফেল করলে চূড়ান্ত নির্বাচনে বিবেচ্য হবে না। মৌখিক পরীক্ষা এবং লিখিত পরীক্ষার মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হয়। মেধা তালিকা তৈরির পর প্রার্থীদের বিভিন্ন কোটায় বাছাই করা হয়। এরপর সরকারি কর্ম কমিশন নির্বাচিত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা সুপারিশ সহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠায়।

মেডিকেল চেক আপ এবং পুলিশ ভ্যারিফিকেশনের কাজটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয়ের সাহায্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পাদন করে। এরপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে নিয়োগ চুড়ান্ত করে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১.৪: বিসিএস নিয়োগে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সঃ

বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী স্নাতক পাশ তবে ৩ বছরের স্নাতকের ক্ষেত্রে স্নাতোকোত্তর প্রয়োজন। সাধারণ প্রর্থীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বছর হতে হবে তবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য ৩২ বছর করা হয়েছে।

৬.১.৫-বাংলাদেশে নিয়োগ পদ্ধতির সমস্যা ঃ

- প্রশাসনিক কার্যালয়ে কোটা পদ্ধতিকে কর্মদক্ষতা হ্রাসের অন্যতম বড় কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এবং সিভিল সার্ভিসে কোটার মাধ্যমে নিয়োগের একটি দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।
- স্বজনপ্রীতি প্রশাসনিক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বড় সমস্যা। একজন সিনিয়র কর্মকর্তা তার এলাকা বা আত্নীয় স্বজনের চাকুরির জন্য তদবিরে লিপ্ত হয়।
- বর্তমানে নিয়োগ ব্যবস্থা সনাতনী হওয়ায় এই পদ্ধতির মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা কঠিন।
- সারা বিশ্বে যখন কর্মচারী প্রশাসনের গবেষণা কার্যক্রম অত্যাধিক গুরুত্ব লাভ করছে তখন বাংলাদেশের PSC বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিয়োগ পদ্ধতির উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেনা বললেই চলে।
- পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে ACR সঠিকভাবে প্রণীত হয়না তাছাড়া এখানে যথেষ্ঠ পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকে।
- নিয়োগ পদ্ধতিতে দীর্ঘ সুত্রিতার কারনে প্রার্থীগণ তাদের উদ্যম হারিয়ে ফেলে।
- অনেক সময় পিএসসি'র সুপারিশ সমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মানতে চান না। তাছাড়া Consultation Regulation-1991-এর মাধ্যমে সরকার অনেক ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছেন যাতে স্বজনপ্রীতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।
- মৌখিক পরীক্ষা ২০০ নম্বরের হওয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেছে।
- প্রাধিকার কোটায় যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় অনেক পদ খালি থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১.৬-নিয়োগ পদ্ধতি উন্নয়নে সুপারিশ ঃ

- এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে সিভিল সার্ভিসে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মেধাবীদের প্রবেশ প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে তা সম্ভব হচ্ছে না। কোটা পদ্ধতি বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগের হার কমিয়ে আনা উচিত।
- পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে ACR পদ্ধতিকে বস্তুনিষ্ঠ ও পক্ষপাত মুক্ত করা উচিত। তাছাড়া বছরে একবার কার্যমূল্যায়ন না করে সময়ে সময়ে কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে এসিআর প্রণয়ণ করা উচিত।
- পিএসসি কে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করে স্বায়ত্ব শাসনের পরিধি বৃদ্ধি করা উচিত।
- এমসিকিউ পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন তাছাড়া প্রার্থীদের পূর্ববর্তী একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে বাছাই করা যেতে পারে এতে করে মেধাবীরা আগ্রহী হবে। এবং প্রাথমিক বাছায়ে প্রার্থীদের সংখ্যা অনেক কমে যাবে।
- দীর্ঘ সূত্রীতা পরিহার করে নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা উচিত।
- নিয়োগ কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পিএসসি তে অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োগ করা উচিত।
- মৌখিক পরীক্ষায় ১০০ নম্বর হওয়া উচিত যা ২৭, ২৮ ও ২৯ তম বিসিএস এ ছিল। তাতে দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২-প্রশিক্ষণ ঃ

Training is defined as any developmental activity which increases knowledges and skills – (Sweeney :1998).

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সাথে প্রশাসনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কর্মীপ্রশাসনে ট্রেইনিং বিষয়টি গুরুত্বের দাবিদার।

৬.২.১ঃ সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ ঃ

সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ হলো একটি Reciprocal Porcess. এর মাধ্যমে কর্মীদের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কোন কর্মকর্তাকে চূড়ান্ত নিয়োগ দেয়া হয় না যদি না সে সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে। সুতরাং সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ অধিকতর গুরুত্ব বহন করে।

৬.২.২ঃ প্রশিক্ষণের আইনগত ভিত্তি ঃ

বাংলাদেশে পাবলিক সার্ভিস প্রশিক্ষণের আইনগত ভিত্তি রয়েছে। The BCS Recruitment Rules-1981 অনুসারে কোন ব্যক্তি চাকুরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে তার প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন হবে বা গ্রহণ করতে হবে।

৬.২.৩ঃ সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকাঃ

সরকারি কার্যবিধি সূচি ১ অনুসারে কর্মকর্তা কর্মচারীদের দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সকল কার্যাবলি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাধারণ দায়িত্বের অংশ বিশেষ। বর্তমানের

লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দানের সাথে জড়িত। এ প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে তার নির্দেশানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালনা করে।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (Presidential Order No.26, 1984) অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের ২৮শে এপ্রিল সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (COTA), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্টেশন (NIPA), বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্টেটিভ স্টাফ কলেজ (BASC) এবং স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (STI)-এর সমন্বয়ে ঢাকার অদূরে সাভারে সকল প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা বিপিএটিসি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংক্ষেপে, এই প্রতিষ্ঠানটি পিএটিসি নামে পরিচিত।

বিপিএটিসি-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী :

প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোকে নিয়মিত দীর্ঘমেয়াদি ও অনিয়মিত স্বল্পমেয়াদি এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমে নিয়মিত কোর্সগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে:

ক. সিনিয়ার স্টাফ কোর্স

এই কোর্সের নাম হচ্ছে সিনিয়ার স্টাফ কোর্স। এর মেয়াদ হচ্ছে ৩ মাস। বছরের দুটি নিয়মিত কোর্সে এক সময়ে ২৫ থেকে ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। পদমর্যাদার দিক থেকে এই কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ হলেন বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম-সচিব, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান, মহাপরিচালক এবং সদস্য যাদের চাকরি ১৫ বছরের বেশি। প্রশিক্ষণার্থীদের একাডেমী প্রাঙ্গণে কোর্স চলাকালীন থাকতে হয় এবং আবাসিকতা বাধ্যতামূলক।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি

১. অংশগ্রহণকারীদের জন্য তাঁদের কর্মস্থান থেকে দূরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মনোরম পরিবেশে উদ্বেগমুক্ত ও আকর্ষণীয় একটি প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি;

২. তাঁদের নিজ নিজ ভূমিকা, করণীয় ও বিভাগীয় কার্যক্রমে পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্যতা সম্পর্কে ব্যাপকতর উপলব্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পরস্পরের মধ্যে ধারণা ও অভিজ্ঞতার অবাধ বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি;

৩. অংশগ্রহণকারীগণ যাতে তাঁদের স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কার্যক্রমকে জাতীয় উন্নয়নের বৃহত্তর দৃষ্টিকোণে দেখতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে সহকর্মীদের কাজের প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেন সেজন্য জাতীয় উন্নয়নের জটিল প্রকৃতি তাঁদের সবার নিকট তুলে ধরা;

৪. স্বীয় দক্ষতার মান ও জ্ঞানের পরিমাণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণকে সচেতন করা এবং প্রশিক্ষণকালে তাঁদের উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান;

৫. যে জটিল সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের ভূমিকা পালন করে থাকেন সে সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে গভীরতর উপলব্ধি সৃষ্টি;

৬. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে অংশগ্রহণকারীগণকে নবজ্ঞান প্রদান এবং জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত সামগ্রিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করানো;

৭. একটি পরিবর্তনশীল সমাজের জরুরী সমস্যাসমূহ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন, সূক্ষ্ম চিন্তা এবং ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীগণকে সহায়তা করা।

কোর্সের লক্ষ্য

১. উন্নয়ননীতি ও বাস্তবায়নের তাত্ত্বিক কাঠামো সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিতকরণ;

২. তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের গুরুত্ব ও পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে চেতনার সৃষ্টি; এবং

৩. তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রশাসন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

কোর্স বিবরণী

কোর্সটির পাঠ্যসূচি নিম্নরূপ:

১. উন্নয়ন অর্থনীতি

২. লোকপ্রশাসন

৩. উন্নয়ন অর্থনীতি/লোকপ্রশাসন সম্পর্কে কর্মশালা/আলোচনা

৪. শিক্ষা সফর

৫. সেমিনার

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

(ক) সিন্ডিকেট পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীগণ অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের কাছ থেকে শিখবার সুযোগ পেয়ে থাকেন। প্রশিক্ষণ-চাহিদা ও পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য অনুযায়ী বিষয়াবলি নির্ধারণ করা হয়। সদস্যদের পূর্বদক্ষতা সিন্ডিকেট পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বিবেচ্য বিষয়ের ওপর লিখিত প্রতিবেদন পেশ করে আলোচনা শুরু করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পর্যালোচনা শেষে বিষয়ের ওপর সুপারিশমালাসহ প্রতিবেদন তৈরি করা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তা সকল সিন্ডিকেটের সভায় পেশ করা হয়। উৎকৃষ্ট প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং এগুলো ভবিষ্যতে

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান ও সচিব মনোনীত করেন এবং নিজেরা সিন্ডিকেট পরিচালনা করেন।

(খ) বক্তৃতা পদ্ধতি : এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। জাতীয় উন্নয়নে সাম্প্রতিক ধ্যান-ধারণা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি অধিবেশনেই প্রশ্নোত্তর পর্ব রয়েছে। কেন্দ্র বিশ্বাস করে, অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে এই পদ্ধতির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

(গ) সেমিনার প্রতিবেদন: প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর স্বলিখিত সেমিনার ও প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হয়।

(ঘ) শিক্ষা সফর : প্রত্যেক কোর্সেই স্থানীয় ও বৈদেশিক শিক্ষা সফর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষা সফর শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করতে হয়।

(ঙ) বিশেষ পাঠ্যক্রম : ঊর্ধ্বতন অনুষদ সদস্যগণ একটি গ্রুপের জন্য বিশেষ পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করে দেন। এই সূচী প্রশিক্ষণার্থীগনকে স্বচ্ছতর ও ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করে।

জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীগণকে তাঁদের সাফল্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ডিভিশনে প্রশিক্ষণার্থীর ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রতি প্রশিক্ষণার্থীকে নিম্নলিখিত নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয় :

(১)	সিন্ডিকেট প্রতিবেদন	...	১২০
(২)	সেমিনার প্রতিবেদন	...	৮০
(৩)	শিক্ষা সফর	...	৫০
(৪)	রেকটরের মূল্যায়ন	...	৫০
			মোট = ৩০০ নম্বর

Dhaka University Institutional Repository

খ. প্রশাসন ও উন্নয়নে উচ্চতর কোর্স

দ্বিতীয় দীর্ঘমেয়াদি কোর্সটি 'প্রশাসন ও উন্নয়নে উচ্চতর কোর্স' নামে পরিচিত। এই কোর্সের মেয়াদ হল তিন মাস। বছরে ১ থেকে ২টি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি কোর্সে ৩০ জন কর্মকর্তা যোগ দেন। এ কোর্সের আওতাভুক্ত হচ্ছেন মধ্যস্তরীয় কর্মকর্তাগণ। তাঁদের সবাইকে কোর্স চলাকালীন একাডেমীতে থাকতে হয় এবং তাঁদের থাকার জন্য সুব্যবস্থা রয়েছে। এ কোর্সটি মধ্য-সোপান কোর্স বলে পরিচিত।

কোর্সের উদ্দেশ্য

(ক) মধ্য সোপানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি;

(খ) ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি;

(গ) দক্ষতার সঙ্গে সরকারি কাজকর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা

দেওয়া এবং তৎসম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি;

(ঘ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন জটিলতা বিশ্লেষণ করে প্রকল্প প্রশাসনে দক্ষতা সৃষ্টি;

(ঙ) সরকারি বাজেট পদ্ধতি এবং অর্থ-প্রশাসনিক সমস্যাবলি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিতকরণ;

(চ) এছাড়াও তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া; এবং

(ছ) নীতি নির্ধারণে ও উচ্চতর দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি উৎসাহিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

কোর্স বিবরণী

দুটি প্রধান বিষয়ে মোট বারটি মডিউলে কোর্সটি ভাগ করা হয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে : লোকপ্রশাসন ও উন্নয়ন অর্থনীতি। এ তাত্ত্বিক কোর্স ছাড়া বাস্তবক্ষেত্রে প্রকল্প/ঘটনা পর্যালোচনা, (কেস স্টাডি) সেমিনার প্রতিবেদন উপস্থাপন, পুস্তক সমালোচনা ও দু সপ্তাহের শিক্ষা সফর এ কোর্সের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

(ক) বক্তৃতা পদ্ধতি।

(খ) **সেমিনার প্রবন্ধ**-কোর্সের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সেমিনারের বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। অনুষদ সদস্যের তত্ত্বাবধানে সেমিনার প্রবন্ধ তৈরি করতে হয়। প্রশিক্ষণার্থীগণ আনুষ্ঠানিকভাবে সেমিনারে এই প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

(গ) **পর্যালোচনা অধিবেশন–** এ অধিবেশনে পারস্পারিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে অনুষদ সদস্য ও প্রশিক্ষণার্থীগণ সমঝোতায় উপনীত হতে পারেন। কার্যকরী প্রশিক্ষণের জন্য এ অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) শিক্ষা সফর– অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রেক্ষিতে বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ যাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়, সে-জন্য শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়।

(ঙ) কেস স্টাডি সেমিনার– এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীগণই কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের কেস স্টাডি পর্যালোচনা করেন। ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব যথেষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

মুল্যায়ন পদ্ধতি

এ কোর্সের জন্য মোট ৭০০ নম্বর রয়েছে। এ নম্বর নিম্নোক্তভাবে বণ্টন করা হয়েছে :

(১)	লোকপ্রশাসনে চূড়ান্ত পরীক্ষা	:	১৫০
(২)	উন্নয়ন অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পরীক্ষা	:	১৫০
(৩)	সেমিনার পেপার	:	১০০
(৪)	ঘটনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন	:	১০০
(৫)	শিক্ষা সফর ও পুস্তক পর্যালোচনা	:	১০০
৬)	কোর্স উপদেষ্টার মূল্যায়ন	:	১০০
			মোট : ৭০০

গ. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

তৃতীয় দীর্ঘমেয়াদি কোর্সটিকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স বলা হয়। এ কোর্স ৪ মাস ধরে চলে। এ কোর্স বছরে দুটি করে অনুষ্ঠিত হয়। এক একটি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের সংখ্যা হচ্ছে ২০০। বি. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং নব নিয়োগপ্রাপ্ত বি. সি. এস. ক্যাডার সদস্যরাই এ কোর্সের শিক্ষানবিস হিসেবে যোগ দেন। এ কোর্সের প্রকৃতি ও হচ্ছে প্রথম দুটি কোর্সের ন্যায় আবাসিক।

কোর্সের উদ্দেশ্য

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কে একটি মৌল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এ প্রশিক্ষণ কোন বিশেষ ক্যাডার বা বৃত্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে না। দীর্ঘ কর্মজীবন শুরু করে পূর্বে যেসব সাধারণ ও মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়াই হচ্ছে

এ কোর্সের উদ্দেশ্য। শিক্ষানবিস কর্মকর্তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং তাঁদের গতিশীল নেতৃত্বের উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে :

- কঠোর শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের নিজেদের অন্তর্নিহিত কর্মক্ষমতা আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করা;
- প্রশিক্ষণার্থীদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমস্যার সমাধান করার জন্য উপযুক্ত মনোভাব সৃষ্টি করা:
- সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার জন্য বিভক্ত ক্যাডারে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক উৎসাহিত করা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সহযোগ-স্পৃহা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি;
- প্রশাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক জ্ঞান বৃদ্ধি এবং অবাস্তব, দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন করা;
- সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আচার-আচরণ, আদব-কায়দার সঙ্গে পরিচিত করা;
- ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয়ে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা;
- সরকারি কর্মকমিশনের পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষাদান।

পাঠ্য বিবরণী

এ পাঠ্যক্রমের পাঠ্য বিষয়সমূহ সরকারি কর্মকমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে সরকার নির্ধারণ করেছে। এ পাঠক্রমে তিনটি বিষয় পড়ানো হয়। বিষয়গুলো হচ্ছে:

(১) বাংলাদেশ চর্চা

(২) লোকপ্রশাসন

(৩) উন্নয়ন অর্থনীতি।

এছাড়া নিম্নলিখিত প্রায়োগিক বিষয়সমূহও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত

৪ – ১ অফিস ৪ পদ্ধতি, বিধি ও প্রবিধি

৪ – ২ সভা পরিচালনা

৪ – ৩ গ্রামাঞ্চলে সমীক্ষা ও প্রতিবেদন রচনার কৌশল

৪ – ৪ মৌখিক উপস্থাপনার কৌশল ও বক্তৃতা

৪ – ৫ শরীরচর্চা ও খেলাধুলা।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা ছাড়াও প্রশিক্ষণের অন্যান্য পদ্ধতি, যথা- আলোচনা, রোল , কেস স্টাডি, প্যানেল আলোচনা ও একক কাজ, কর্মশালা, ছবি প্রদর্শন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণে চিত্তাকর্ষক সহজবোধ্য সহায়কের ব্যবহার থাকবে। বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে প্রশাসনসংক্রান্ত কলাকৌশল শেখানো ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ানোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে। এছাড়াও থাকবে গ্রামাঞ্চলে সমীক্ষা, কমিটি কার্যক্রম, পুস্তক সমালোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও শরীরচর্চা।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রশিক্ষণ কোর্সের চলতি ও ভবিষ্যৎ কোর্সকে ফলপ্রসূ করার জন্য মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোর্স চলাকালে জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল (এনটিসি) ও বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্ধারিত বিভিন্ন ছকে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে পাঠ্যক্রম ও পাঠক্রমের বাইরে সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যক্রমের বাইরে উভয়বিধ কৃতিত্বের মূল্যায়ন করা হয়। কোর্স পরিচালক, কোর্স সমন্বয়ক এবং কেন্দ্রের অন্যান্য অনুষদ সদস্য প্রশিক্ষণার্থীকে মূল্যায়ন করে

থাকেন। প্রশিক্ষণার্থীগণও কোর্সের বিভিন্ন দিকের এবং প্রশিক্ষকদের নির্ভয়ে মূল্যায়ন করার সুযোগ পান।[১৪]

চারমাসব্যাপী কোর্স শেষে সরকারি কর্মকমিশন পূর্ববর্ণিত তিনটি বিষয়ে ৩০০০ নম্বরের একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করে। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একজন প্রশিক্ষণার্থীকে কমপক্ষে ৪০% নম্বর পেতে হবে। পরীক্ষার দিন কর্মকমিশন ধার্য করে থাকে।

প্রতি প্রশিক্ষণার্থীর জন্য নিম্নলিখিতভাবে ৩০০ নম্বরে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এ কোর্সের মেয়াদ হচ্ছে দু'মাস এবং সর্বমোট নম্বর হচ্ছে ১৮০০।

(১)	লিখিত পরীক্ষা টার্ম পেপার ও অনুশীলন নম্বর	:	১৩০০
(২)	শরীরচর্চা ও খেলাধুলা	:	১০০
(৩)	গবেষণা প্রতিবেদন	:	১০০
(৪)	ক্লাশে উপস্থিতি	:	১০০
(৫)	মৌখিক উপস্থাপনা	:	১০০
(৬)	কোর্স উপদেষ্টার মূল্যায়ন	:	১০০
			মোট = ১৮০০

এ কোর্স ছাড়াও নবীন বি. সি. এস. ক্যাডারভুক্ত প্রশাসক যেমন ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনারদের জন্য রয়েছে ৮ সপ্তাহের একটি আইন বিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স, প্রকৌশলী ও ডাক্তারদের জন্য ৩ সপ্তাহের ব্যবস্থাপনা কোর্স, পুলিশ ও নিরাপত্তা অফিসারদের জন্য ২ সপ্তাহব্যাপী মানবসম্পর্ক কোর্স এবং উর্ধ্বতন সহকারী সচিব, প্রকল্প পরিচালক ও সহকারী পরিচালকের (গবেষণা প্রকল্প) জন্য ৮ সপ্তাহব্যাপী প্রকল্প প্রণয়ন মনিটারিং ও মূল্যায়ন কোর্স। এই প্রতিষ্ঠান ৩০ জুন ১৯৯০ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ছাড়াও ২৫টি কর্মশালা (সেমিনারে যথাক্রমে ৬০৪০ জন এবং ১১১৬ জন সহ মোট ৭১৫৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠান ৩৮ টি গবেষণা সম্পন্ন করেছে এবং কয়েকটি গ্রন্থ ও দুটি জার্নাল প্রকাশ করে আসছে।

---

[১৪] মোহাম্মদ শামসুর রহমান, "*লোকপ্রশাসন তত্ত্ব ও বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন*" খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা।

উপরোক্ত দীর্ঘমেয়াদী কোর্স ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার জন্য বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত কোর্স। তার একটি চিত্র নিম্নোক্ত সারণিতে তুলে ধরা হয়েছে :

লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত সংক্ষিপ্ত কোর্স

কোর্সের নাম	কর্মকর্তা পর্যায়	সময়
নবায়ন কোর্স	উর্ধ্বতন	৩ দিন
আচরণ ও শৃঙ্খলা কোর্স	মধ্যস্তরীয়	৩ দিন
আচরণ ও শৃঙ্খলা কোর্স	মধ্যস্তরীয়	৭ দিন
নবায়ন কোর্স	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত	৩ দিন
মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে		
সহমর্মিতা সমন্বয় কোর্স		৭ দিন
প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	লোকপ্রশাসন কেন্দ্রে	
	নব নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ	১৪ দিন

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নন-গেজেটেড সরকারি কর্মীর জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। সাভার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে যেমন- ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে এরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

উৎস : বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি, ১৯৮৬ ও ১৯৯০-৯১

৬.২.৪-ক্যাডার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানঃ

টেবিল ৪-বাংলাদেশের সরকারি সংগঠন তথা সিভিল সার্ভিসের মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।

ক্র.নং	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	ক্যাডার
সাধারণ ক্যাডার সমূহ		
০১	বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সকল ক্যাডার
০২	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এ্যডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি	বিসিএস (প্রশাসন)
০৩	বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমি	বিসিএস (পররাষ্ট্র)
০৪	পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমি	বিসিএস (পুলিশ)
০৫	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী	বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)
০৬	আনসার একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর	বিসিএস (আনসার)
০৭	বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট ট্রেইনিং একাডেমি	বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী)
০৮	বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ কলেজ	বিসিএস (সমবায়)
০৯	ফুড ডিপার্টমেন্ট ট্রেইনিং ইন্সস্টিটিউট	বিসিএস (খাদ্য)
১০	ন্যাশনাল ইন্সস্টিটিউট অব পপুলেশন রিসার্স এন্ড ট্রেইনিং	বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)
১১	পোস্টাল ট্রেইনিং একাডেমি	বিসিএস (ডাক)
১২	রেলওয়ে ট্রেইনিং একাডেমি	বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহণ ও বাণিজ্যিক)
১৩	ট্যাক্স ডাইরেক্টেশন ট্রেইনিং একাডেমি	বিসিএস (কর)
১৪	ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্লানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট	বিসিএস (ইকোনোমিক)
১৫	ন্যাশনাল ইন্সস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন	বিসিএস (তথ্য)
প্রফেশনাল/ টেকনিক্যাল ক্যাডার সমূহ		
১৬	কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	বিসিএস (কৃষি)
১৭	মৎস্যচাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বিসিএস (মৎস্য)
১৮	ফুড ডিপার্টমেন্ট ট্রেইনিং ইন্সস্টিটিউট	বিসিএস (খাদ্য)
১৯	জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি একাডেমি	বিসিএস (স্বাস্থ্য)
২০	ন্যাশনাল ইন্সস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন	বিসিএস (তথ্য)
২১	রেলওয়ে ট্রেইনিং একাডেমি	বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল)
২২	জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি একাডেমি	বিসিএস (জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল)
২৩	টেলিকম ট্রেইনিং সেন্টার	বিসিএস (টেলিযোগাযোগ)
২৪	জাতীয় শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (নায়েম)	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
২৫	বন গবেষনা ইনস্টিটিউট	বিসিএস (বন)

৬.২.৫-বাংলাদেশে প্রশিক্ষণের সমস্যাসমূহঃ

বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কতগুলি সমস্যায় জর্জড়িত- যার অধিকাংশই সৃষ্টি হয়েছে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও পদক্ষেপ গ্রহণের অবহেলার কারণে। নিম্নে বাংলাদেশে প্রশিক্ষণের কতগুলো সমস্যা তুলে ধরা হলো:

১) **সুষ্ঠু নীতিমালার অভাব :** বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোন সরকারী প্রশিক্ষণ নীতিমালা ছিল না। তাই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালিত হতো সম্পূর্ণ এড-হক ভিত্তিতে। সরকারী নীতি প্রণীত হলেও আজ পর্যন্ত তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অনেকক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় না।

২) **কোর্সের উদ্দেশ্য :** যে যে বিষয়ের উপর কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট নয়।

৩) **বৈদেশিক প্রশিক্ষণের স্বল্পতা :** আমাদের দেশে পর্যাপ্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ নেই। উচ্চ শ্রেণীর কিছু কর্মকর্তা ব্যতীত কার্যকরী স্তরের কর্মচারীদের ভাগ্যেও প্রশিক্ষণ জোটে না বললেই চলে।

৪) **তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ :** বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের চেয়ে তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ বেশি দেয়া হয়। ফলে কর্মীগণ কাজে দক্ষ হয়ে উঠে না।

৫) **সমাজতাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের অভাব :** বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাতে বাস্তবতার ছোঁয়া থাকে না বললেই চলে। যেমনঃ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুব কম ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

৬) **প্রশিক্ষণ উপকরনের স্বল্পতা :** প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরনের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণে দীর্ঘসূত্রীতা পরিলক্ষিত হয়।

৭) **এলিট মনোভাব :** বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কর্মকর্তাগণ সবসময় নিজেকে আমলা ভাবেন এবং নিজেদেরকে একটি স্বতন্ত্র্য শ্রেণী হিসাবে মনে করেন- যার জন্য তারা একদিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে না এবং অন্যদিকে, অর্জিত জ্ঞানের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় না।

৮) **প্রশিক্ষকের স্বল্পতা :** এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশে ভাল প্রশিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ এবং অনেক সময় তাদের অনেককে শাস্তিস্বরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হয় বলে ধারণা করা হয়।

৯) **প্রয়োগ সমস্যা :** জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিতে যেমন প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন তেমনি তার যথাযথ প্রয়োগও নিশ্চিত করা আবশ্যক। কিন্তু প্রয়োগ সমস্যা বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা। আমাদের দেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অধিকাংশ ব্যক্তির নিয়োগ প্রশিক্ষণের বিষয়ের সাথে অসঙ্গিতপূর্ণ। এর ফলে প্রশিক্ষণ হতে ইপ্সিত সুফল পাওয়া যায় না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার না করে ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় উন্নয়ন বাধ্যগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করা হয়।

৬.২.৬-সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ :

বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ কার্যকর অবদান রাখতে পারবে যখন উল্লেখিত সমস্যার সমাধান করে প্রশিক্ষণের প্রতি ব্যবস্থাপনার অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করা হবে। নিম্নে সমস্যার সমাধানের জন্য কতিপয় সুপারিশ করা হলো:

১) প্রশিক্ষণের জন্য প্রণীত সরকারী নীতি যাতে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২) প্রশিক্ষণরত কর্মীদের যে বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে তা পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে; যাতে তারা বাস্তব ক্ষেত্রে তা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে দেশকে সমৃদ্ধশীল করতে পারে।

৩) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ শুধু তত্ত্বীয় প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীরা খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করে না। তাই হাতে কলমে তথা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যাতে আমরা বিপুল সংখ্যক দক্ষ কর্মী পেতে পারি।

৪) প্রশিক্ষণগৃহীত কর্মকর্তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে আমলা না ভেবে মনে করবে আমি একজন শিক্ষার্থী এবং একই সাথে প্রজাতন্ত্রের একজন সেবক। তাহলেই তারা প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে বুঝতে এবং যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৫) একটি দেশকে সমৃদ্ধশালী করতে গেলে স্বল্পসময়ে বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হয়। আর এই জন্য দরকার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ সুবিধা তথা প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি। হোস্টেল সুবিধা, লাইব্রেরী সুবিধা, ভাতা এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকরণ যথাযথভাবে সরবরাহ করা হলে প্রশিক্ষণের সুফল পাওয়া যাবে।

৬) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৭) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দীর্ঘ সময়ের জন্য নিয়োগ দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩-পদোন্নতি

পদোন্নতি বলতে সাধারণভাবে পদ যোগান বা সম্মানগত উন্নতি বুঝায়। শুধুমাত্র বেতন স্কেল এর উন্নতি দ্বারা একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পদোন্নতি হয় না। বরং পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন স্কেল পরিবর্তন ছাড়াও কর্মের দায়িত্বের পরিধি ও সম্মান বা র‍্যাঙ্ক পরিবর্তন বুঝায়। এমনকি বেতন স্কেল একই থাকলেও দায়িত্ব ও র‍্যাঙ্ক পরিবর্তনের মাধ্যমে একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পদোন্নতি হতে পারে।

৬.৩.১-বাংলাদেশে পদোন্নতি পদ্ধতি

জন প্রশাসনের বর্তমান ধারায় নিজস্ব ক্যাডার বা সার্ভিসে ঐ ক্যাডার বা সার্ভিসের কম্পোজিশন ও ক্যাডার রুলের ভিত্তিতে নিয়োগ বিধিমালার আলোকে পদোন্নতি প্রদানের জন্য গঠিত বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তবে সরকারের সকল গ্রেড ১, ২ ও ৩ ভুক্ত পদে পদোন্নতি সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এছাড়া সকল ডিপার্টমেন্ট, কর্পোরেশন ইত্যাদির গ্রেড ১, ২ ও ৩ ভুক্ত পদ, পরিচালনা পরিষদের সদস্য/পরিচালক, সংস্থা প্রধান পদের পদোন্নতি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গঠনের অর্ডিন্যান্স বা নিয়োগ বিধির আলোকে এসএসবি'র মাধ্যমে প্রদান করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত এই বোর্ডের অন্যান্য সদস্য হচ্ছেন মুখ্য সচিব, সংস্থাপন সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, অর্থ সচিব, আইন সচিব এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল। পদ শূন্যতা সাপেক্ষে ফিডার পদে নির্দিষ্ট মেয়াদসহ অন্যান্য যোগ্যতা পূর্ণ করলে তবেই একজন কর্মকর্তা পদোন্নতি পেতে পারেন।

প্রশাসনের (বিসিএস) প্রাথমিক স্তর সহকারী কমিশনার বা সহকারী সচিব পদে একজন কর্মকর্তা নিয়োগ লাভের পর শিক্ষানবিশ কাল সমাপনান্তে নির্দিষ্ট সময়কালান্তে প্রয়োজনীয় বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ও অন্যান্য শর্ত প্রতিপালনান্তে কর্মে স্থায়ী হন। অতঃপর অন্যান্য সকল যোগ্যতা অর্জন ও পদশূন্যতা সাপেক্ষে সরকারের নীতি নির্ধারনী পদের প্রাথমিক সোপান উপ-

সচিব পদে এসএসবি-এর মাধ্যমে পদোন্নতি পেতে পারেন। সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে একজন কর্মকর্তা ৫ বছর চাকুরী করলে সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পেতে পারেন। বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষার মাধ্যমে এই পদোন্নতি প্রদান করা হয় সন্তোষজনক চাকুরীর রেকর্ডের ভিত্তিতে।

৬.৩.২-পদোন্নতি বিষয়ক নীতিমালা ঃ

বিভিন্ন সময়ে সরকারের উপ-সচিব ও তদূর্ধ্বপদ সমূহে পদোন্নতির নীতিমালা প্রণীত পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী শুধুমাত্র বিগত ৫ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রচলিত থাকে। সরকার ১৯৯৭ সালে জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করে। এই কমিশন জন প্রশাসনের বিভিন্ন দিকের পাশাপাশি নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন বিষয়েও সুপারিশ প্রণয়ন করে।

কমিশন সিভিল সার্ভিস সংস্কার বিষয়ে উল্লেখ করে যে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের পূর্বসূরী ব্রিটিশ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসকে কার্যসম্পাদন দক্ষ ও কার্যকর বিবেচনা করা হত। এসব সার্ভিসকে সীমিত কাজ করতে হত, যার বেশির ভাগই ছিল নিয়ন্ত্রণমূলক কাজেই দক্ষতার সঙ্গে এসব কাজ সম্পাদন করাও ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা পূরনের জন্য সিভিল সার্ভিসকে বিশাল ও জটিল উন্নয়নমূলক কাজ করতে হয়। বেশ কিছু কারণের জন্য মনে করা হয় যে, এ সুবিশাল কাজ সম্পাদনে সাধারণভাবে এ সার্ভিসের সদস্যরা অভ্যস্ত নন অথবা সে জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা দক্ষতাও তাদের নেই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা এখন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসকে অদক্ষ ও অকার্যকর হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। সিভিল সার্ভিসের নিম্ন পর্যায়ে সহায়ক স্টাফের মানও নিচু। এ অবনতির কারণ হয়েছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের অভাব এবং শৃঙ্খলা প্রয়োগের ক্ষেত্রে শৈথিল্য। গভর্ণমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস

Dhaka University Institutional Repository

রিফর্মিং দি পাবলিক সেক্টর (বিশ্ব ব্যাংক ১৯৯৬) সরকারকে প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, অত্যন্ত পরিব্যাপ্ত, অতিশয় আমলাতান্ত্রিক, শাসনকাজে যথেষ্ট স্বেচ্ছাধীন, মাত্রাতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত, জবাবদিহিতা বর্জিত ও অপচয়ী বলে চিত্রিত করেছে।"

এ প্রেক্ষিতে কমিশন সুপারিশ করে যে, "জন প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির ভিত্তি হবে মেধা।" এই প্রেক্ষাপটে বিগত বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার কিছু পর জনপ্রশাসনে মেধাকে গুরুত্ব প্রদান পূর্বক পদোন্নতি প্রথা প্রচলনের কাজ হাতে নেয়। প্রসঙ্গতঃ আরো উল্লেখ্য যে, বর্তমান পদোন্নতি বিধিমালা জারীর পূর্বে শুধুমাত্র বিগত ৫ বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের ভিত্তিতে পদোন্নতির নীতিমালা প্রচলিত ছিল। ৫ বছরের একজন কর্মকর্তা ১ বা ২ জন কর্মকর্তার অধীনে সাধারণতঃ কাজ করে থাকেন তাই শুধুমাত্র ১ বা ২ জন উর্দ্ধতন কর্মকর্তার মুল্যায়ন ভিত্তিতে একজন কর্মকর্তাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হতো না। অন্যদিকে নানা প্রক্রিয়ায় বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে উচ্চতর নম্বর প্রাপ্তির মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ায় পদোন্নতি ক্ষেত্রে সঠিক কর্মকর্তা মূল্যায়ন কঠিন হয়ে পড়ে।

বর্তমানে প্রচলিত বিধিমালা অনুযায়ী উপ-সচিব পদের ২৫% এবং যুগ্ম-সচিব ও তদূর্ধ পদের ৩০% পদ অন্যান্য সার্ভিস বা ক্যাডারের কর্মকর্তা এবং উপ-সচিব পদের বাঁকী ৭৫% এবং অন্যান্য পদের ৭০% পদ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয। তবে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিজস্ব পদ সোপান না থাকায় এই সার্ভিসের জন্য বিভিন্ন স্তরে ১৩০ টি পদ বিভাগীয় পদ্ধতিতে পূরনের জন্য নির্দিষ্ট রাখা আছে।

১২ জুন, ২০০২ ইং তারিখে সরকার উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতির বিধিমালা-২০০২ জারী করেছে। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে পদোন্নতি নীতিমালা

থাকলেও ঘন ঘন পরিবর্তন রোধের প্রত্যাশায় এই প্রথম বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান পদোন্নতি বিধিমালার মূল্যায়ন নম্বর ১০০ স্থির করে তা নিম্নভাবে ভাগ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	বর্তমান বিধিমালার বিভাজিত মোট নম্বর
(১)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	২৫
(২)	বিগত পাঁচ বছরের বার্ষিক বা গোপনীয় প্রতিবেদনের গড়	৩০
(৩)	চাকুরী জীবনের শুরু হতে বিগত পাঁচ বছরের পূর্ব পর্যন্ত সকল বছরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের গড়	২৫
(৪)	সামগ্রিক চাকুরী জীবনে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে কোনো বিরূপ মন্তব্য না থাকার জন্য বোনাস নম্বর	১০
(৫)	সামগ্রিক চাকুরী জীবনে কোনো শাস্তি না থাকার জন্য নম্বর	১০
	মোট নম্বর	১০০

শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর নিম্নরূপভাবে বিভাজিত ঃ

পরীক্ষার পাশের নাম	প্রথম বিভাগ/শ্রেণীর জন্য পদত্ত নম্বর	দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণীর জন্য প্রদত্ত নম্বর	তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণীর জন্য প্রদত্ত নম্বর
এস.এস.সি	৬	৪	২
এইচ.এস.সি	৬	৪	২
গ্রাজুয়েশন	৯	৬	৩
মাষ্টার্স	৪	৩	২

বিগত ৫ বছর ও বাকী কর্মজীবনের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের ভিত্তিতে ৩০ + ২৫ = ৫৫ এই নম্বরের হিসাব করা হয়।

সারা কর্মজীবনের এসিআরের পেন পিকচার কলামে প্রদত্ত মন্তব্যের ভিত্তিতে ১০ নম্বর ধার্য্য হয়। ৫ বছরের পূর্বে প্রদত্ত প্রতিটি বিরূপ মন্তব্যের জন্য ৩ এবং ৫ বছরের মধ্যে প্রদত্ত প্রতিটি বিরূপ

মন্তব্যের জন্য ৫ নম্বর কর্তিত হয়। ৫ বছরের পূর্বের অনিস্পন্ন বিরূপ মন্তব্যের জন্য ২ নম্বর কর্তিত হয়।

প্রতিটি লঘু দন্ডের জন্য ২ নম্বর ও গুরুদন্ডের জন্য ৫ নম্বর কর্তন পূর্বক আচরন সংক্রান্ত নম্বর হিসাব করা হয়।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে নম্বর হিসাবের পর নিম্ন ছক অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে পদোন্নতির জন্য এসএসবি সুপারিশ করে থাকে।

উপ-সচিব - ৮৩

যুগ্ম-সচিব ও তদূর্ধ পদ সমূহ - ৮৫

এখানে উল্লেখ্য যে, বিভাগীয় মামলা চালু হলে বা দূর্নীতি মামলায় চার্জশীট দাখিল হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করা হয় না। অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্মকর্তার সামগ্রীক আচরণ বিবেচনায় রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী কাউকে মনোনয়ন প্রদান করা সত্ত্বেও যোগদান না করলে তিনি পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হন না।

(নূন্যতম মূল্যায়ন নম্বর-৮৫) সচিব

(নূন্যতম মুল্যায়ন নম্বর-৮৫) অতিরিক্ত সচিব ৭০% বিসিএস (প্রঃ) ও ৩০% অন্যান্য ক্যাডার

(নূন্যতম মূল্যায়ন নম্বর-৮৫) যুগ্ম-সচিব ৭০% বিসিএস (প্রঃ) ও ৩০% অন্যান্য ক্যাডার

(নূন্যতম মূল্যায়ন নম্বর-৮৩) উপ-সচিব

(২৫%) অন্যান্য ক্যাডারের	(৭৫%) বিসিএস (প্রশাসন)
সিনিয়র স্কেল কর্মকর্তা	সিনিয়র সহকারী সচিব

৬.৩.৩-পদোন্নতি নীতির বিবেচ্য বিষয় :

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে পদোন্নতি নীতি প্রণয়নকালে কতগুলো উপাদান বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়। এই বিবেচ্যনীতি গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন :** পদোন্নতি নীতি অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে। পদোন্নতি নীতি সম্পর্কে কর্মীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও সন্দেহের সৃষ্টি হলে প্রতিষ্ঠানে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তাই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে অস্পষ্ট নীতি পরিহার করা উচিত।

২. **উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ :** পদোন্নতির নীতি প্রণয়নকালে সংগঠনের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তা বিবেচনা করতে হয় নতুবা প্রতিষ্ঠানের কাজে ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে।

৩. **অবগতকরণ :** পদোন্নতি নীতি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করতে হবে, নতুবা এর তাৎপর্য বিনষ্ট হবে। ফলে কর্মীর মনে হতাশার সৃষ্টি হবে এবং নীতি সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হবে।

৪. **ভিত্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা :** কোন ভিত্তির উপর পদোন্নতি দেয়া হবে তা নির্ধারণ করতে হবে এবং এ সম্পর্কে সংগঠন ও কর্মীর মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

৫. **অন্যান্য নীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান :** প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রণীত অন্যান্য নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদোন্নতির নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

৬. **পদোন্নতি নীতি পর্যালোচনা :** প্রতিযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পদোন্নতি নীতি পর্যালোচনা করে নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

৭. **মূল্যায়ন :** কোন কর্মী কতটুকু যোগ্যতা সম্পন্ন তা পদোন্নতিতে বিবেচনা করতে হয়। তাই পদোন্নয়নের জন্য কর্মী মূল্যায়ন, পদমূল্যায়ন ও মেধা মূল্যায়ন করতে হবে।

৮. **প্রশিক্ষণ ও সমতা বজায় রাখা :** পদোন্নতি নীতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে এবং পদোন্নতি নীতি প্রণয়নে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মীর কাজ ও যোগ্যতার মধ্যে যাতে সমতা বজায় থাকে তা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩.৪-বাংলাদেশে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা :

পদোন্নতি কর্মচারী প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় বেশকিছু সমস্যা বিদ্যমান থাকার ফলে প্রশাসন সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না। পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **রাজনৈতিক দল :** শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্তে বিভিন্ন সময় যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে বাদ দিয়ে কম যোগ্য প্রার্থীকে পদোন্নতি প্রদান করে যা প্রশাসনে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। এতে প্রশাসনে এক ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিরোধী মনোভাবের জন্ম নেয়।

২. **চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ :** নিয়োগের ফলে প্রশাসনে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে। অনেক সময এই নিয়োগের কোন স্বচ্ছতা থাকেনা। সরকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আত্তীকরণ (Lateral Entry)-এর মাধ্যমে নিয়োগ দিয়ে থাকে। এ ধরনের নিয়োগের ফলে কর্মচারী পদোন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি হয় এবং পদোন্নতিতে বিলম্ব ঘটে এবং যোগ্য কর্মীরা উচ্চতর পদে যেতে পারে না। ফলে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে এসব কর্মী উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

৩. **স্বজনপ্রীতি :** বাংলাদেশে স্বজনপ্রীতি পদোন্নতির ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। প্রায়শঃই দেখা যায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত পছন্দের প্রার্থীদের স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে পদোন্নতি প্রদান করে থাকে। বড় বড় পদে আত্মীয় থাকার সুবাদে অযোগ্য এবং নিম্নস্তরের অনেক কর্মীই পদোন্নতিতে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। এতে যোগ্য কর্মী বঞ্চিত হয়।

৪. **পদোন্নতি সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান না মানা :** বাংলাদেশে কর্মচারী প্রশাসনে পদোন্নতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান না মানা বিশেষ রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে

সঠিক নিয়ম না মানায় প্রায়শ: অধিক্রমনের (Over lapping) সমস্যা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে বর্ধিত বা সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি না দেয়ায় অনেক কর্মচারীর মনে হতাশা ও ক্রোধ দেখা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ-১৯৯৯ সালে ১৮ তম বিসিএস-এর মাধ্যমে বিসিএস (পরিবার-পরিকল্পনা) ক্যাডারের যাত্রা শুরু এবং উক্ত ক্যাডারে লোক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত উক্ত ক্যাডারের সদস্যরা পদোন্নতি পাননি।[১৫]

৫. **অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার :** বর্তমানে বাংলাদেশে প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সেনা কর্মকর্তাগণ অধিষ্ঠিত। যেমন- চেয়ারম্যান, বেপজা; পরিচালক, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ-এসকল পদ সমূহে সেনা কর্মকর্তাগণ অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ফলে অভিজ্ঞ এবং দক্ষ বেসামরিক কর্মকর্তাগণ ঐসমস্ত পদে অধিষ্ঠিত না হওয়ার ফলশ্রুতিতে প্রশাসনে একধরনের অন্ত:কলহ বিরাজ করছে।

৬. **আঞ্চলিকতা :** বাংলাদেশে উচ্চতর শ্রেণীতে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাগণ প্রায়শ: নিজ নিজ এলাকা বা জেলাগুলোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান। প্রশাসনে নিয়োজিত নিম্ন পদের একই জেলাবাসীকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অধিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ধরনের 'ইজম' পদোন্নতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলে।

৭. **বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (ACR) তৈরীতে পক্ষপাতিত্ব :** অনেক সময় দেখা যায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে কোন নিম্নতম কর্মকর্তার প্রতি অসন্তোষ্ট থাকলে সেক্ষেত্রে Reported Initiative Officer (RIO) ACR পূরণে পক্ষপাতিত্ব করেন বা ন্যায়সঙ্গতভাবে ACR পূরণ করেন না অথবা ACR পূরণে বিলম্ব করেন। ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পদোন্নতিতে দীর্ঘসূচীতা দেখা দেয়।

[১৫] দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০১০, পৃ. ১-২

Dhaka University Institutional Repository

৮. **দুর্নীতি :** সর্বকালেই সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতির প্রচলন ছিল। সম্পূর্ণ দুর্নীতি মুক্ত ছিল এমন কোন শাসনব্যবস্থার কথা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের প্রশাসনে দুর্নীতির মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সরকারী কর্মচারীগণ উদ্ধর্তন কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে পদোন্নতি বাগিয়ে নিচ্ছে। ফলে সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তারা বঞ্চিত হচ্ছে এবং প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ছে।

৬.৩.৫-বাংলাদেশের কর্মচারী প্রশাসনে পদোন্নতির সমস্যা দূরীকরণের সুপারিশসমূহ :

১. **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত প্রশাসন :** প্রশাসনে যাতে কোন রকম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত রাখার জন্য বিচার, আইন ও নির্বাহী বিভাগকে পৃথক করতে হবে।

২. **চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হ্রাস :** সরকারী প্রশাসনের উচ্চপদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং Leteral Entry যতটা সম্ভব কম করতে হবে এবং প্রশাসনের অভ্যন্তরে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এই সকল পদে পদোন্নতি দিতে হবে।

৩. **স্বজনপ্রীতি রোধ :** প্রশাসনে যাতে স্বজনপ্রীতি না হয় সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে। ACR পূরণ কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ইতিহাস জেনে নিকটতম ব্যক্তি যাতে ACR পূরণ না করে সে নীতিমালা প্রয়োগ করা যেতে পারে। একই অঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যাতে নিম্নতম পদোন্নতি প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি না করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা নিয়ে আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৪. **সুস্পষ্ট নীতিমালা :** বাংলাদেশের কর্মচারী প্রশাসনে একটি সুস্পষ্ট পদোন্নতির নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যাতে সকলের জন্য সমান নীতিমালা পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৫. **বিজ্ঞান ভিত্তিক পদোন্নতির নীতিমালা :** অন্যান্য দেশের পদোন্নতি নীতিমালা বিশ্লেষণ করে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে সেখানে সকল কর্মচারী যোগ্যতা এবং সামর্থ্য অনুসারে পদোন্নতি পাবেন।

৬. **দুর্নীতিরোধ :** প্রশাসনে দুর্নীতি যাতে না ঢুকতে পারে এ জন্য সরকারকে ভূমিকা রাখতে হবে। পদোন্নতিতে যেন কেউ দূর্নীতির আশ্রয় না নিতে পারে সে জন্য সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন এবং দক্ষ ও মেধাবী কর্মী নিয়োগ দিতে হবে। কেননা মেধাবীদের মধ্যে কিছুটা দুর্নীতির প্রবণতা কম কারণ তারা জানে দক্ষ ও সৎ হলে পদোন্নতি পাওয়া যাবে এবং মেধাবীদের সরকার সহজে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না।

৭. **সিনিয়রিটি ও মেধার সমন্বয় :** পদোন্নতির দুটি নীতি অর্থাৎ সিনিয়টি ও মেধার কোন একটি ভিত্তি করে সুষ্ঠু পদোন্নতির নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। পদোন্নতির ব্যাপারে কোন একটি নীতি চূড়ান্তভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বরং সুষ্ঠু পদোন্নতির জন্য দুটি নীতিকেই মিলিতভাবে বিবেচনা করা জরুরী। এর ফলে প্রশাসন নতুন ও পুরাতন কর্মচারীর মনে কোন ক্ষোভ থাকবে না।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় সাতঃ বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা

১. সুশাসনের অভাব

সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়নই বলি, বা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নই বলি সবকিছুর মূলেই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে সুশাসন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সুশাসনের অভাব। ২১/০৬/১৪ ইং তারিখে বাংলাদেশ ইকোনোমিস্ট ফোরামের এক সেমিনারে প্রায় সকল বক্তাই সুশাসনের অভাবকে বাংলাদেশের অর্তনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে উল্লেখ করেন।

২. মানবসম্পদ উন্নয়নে সুদুরপ্রসারি পরিকল্পনার অভাবঃ

সারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলি যেখানে মানব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে, সেখানে আমরা এখন পর্যন্ত মানবসম্পদ উন্নয়নে কোন সুদুরপ্রসারি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি নাই। পলিসি রিসার্স ইনস্টিটিউট এর ভাইস চেয়ারম্যান এর মতে "৭০ এর দশকে দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও চীনের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের কাছাকাছি ছিল। সেসব দেশ মূলধন পুঞ্জিভুত করা, শিক্ষা ও দক্ষ শ্রম শক্তির জন্য প্রশিক্ষণ এই কাজগুলি করে উন্নত ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হয়েছে।"[১৬] অর্থাৎ তারা মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছিয়েছে। বাংলাদেশ সেগুলো করতে পারেনি।

৩. সরকারি অফিসের কর্মপরিবেশ সন্তোষজনক নয়ঃ

সরকারি অফিসের কর্মপরিবেশ সরকারি কাজ সঠিকভাবে পালনের জন্য সহায়ক নয়। সরকারি অফিসের সাজসজ্জা খুবই নিম্নমানের। এছাড়াও কম্পিউটার (আইটি) ইন্টারনেট সংযোগ অনেক অফিসেই নেই। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে যা খুবই হতাশাজনক।

[১৬] প্রথমআলো, ২২ জুন ২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সরকারী চাকুরীতে বেতন কাঠামো যুক্তি সঙ্গত নয়ঃ

যেসব উপদান বেতন নির্ধারনে প্রভাব বিস্তার করে তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে।

ক। সামাজিক নীতি

খ। প্রথা ও ঐতিহ্য

গ। শ্রম বা শিল্পজাত উৎপাদন দ্রব্য সামগ্রী

ঘ। কর্মীর চাহিদা ও সরবরাহ।

ঙ। পারিশ্রমিকদের দর কর্ষাকষির ক্ষমতা।

চ। নিত্য-নৈমিত্তিক দ্রব্যের বাজার দর

সরকারী কর্মীর প্রতি সরকারের একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে যা বেসরকারী খাতে একজন নিয়োগকর্তার নেই। সরকারকে একজন আদর্শ নিয়োগকর্তার ভূমিকা পালন করতে হয়। সরকারি কর্মীর সুখ দু:খ দেখা সরকারের একটি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। সরকারি কর্মীরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীর মত তাদের মজুরী বা পরিশ্রমের জন্য দর কষাকষি করতে পারেন না।

একটি সভ্য দেশের নাগরিককে দেশের বর্তমান জীবিকার মান অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহের জন্য যুক্তি সঙ্গত বেতন কাঠামোর নিশ্চয়তা দিতে হবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বেতনক্রমের সঙ্গে সামাঞ্জস্য রক্ষা করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমান না হোক কাছাকাছি বেতন কাঠামো হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। আমাদের দেশে তেমন বেতন কাঠামো নেই। এছাড়াও নিত্য পণ্যের উর্দ্ধগতির সাথেও সামঞ্জস্য রেখে বেতন কাঠামো দেওয়া হয় না। যা মানব সম্পদ উন্নয়নের পথে বাধা।

৫. মেধা যাচাইয়ের সুষ্ঠ ও আদর্শ কোন মানদন্ড নেইঃ

সরকারী চাকুরী তথা ক্যাডার সার্ভিসে যোগ্যও মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে পাড়ছে না বর্তমান নিয়ম নীতি/পদ্ধতি গুলি। প্রথমত: নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে যে যোগ্যতা চাওয়া হয় তা মেধাবীদের

সংগ্রহে সহায়ক নয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে মেধা ও ভাল রেজাল্টকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, ফলে অনেক খারাপ রেজাল্টধারী নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহনের সুযোগ পাচ্ছে। পরীক্ষার্থী সংখ্যা বিসিএস পরীক্ষায় কয়েক লাখ হচ্ছে ফলে সুষ্ঠ ভাবে পরীক্ষা নেয়া PSC এর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে এখন PSC বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের চেষ্টা করছে । শোনা যাচ্ছে ৩৫ তম বিসিএস থেকে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার নম্বর ২০০ করতে যাচ্ছে সরকার।[১৭] এভাবে বারবার পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

৬. পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিক নয়ঃ

মেধাভিত্তিক নিয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে সব পরীক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা কতটা বিজ্ঞান ও বাস্তব সম্মত প্রশ্ন সাপেক্ষ। মেধাভিত্তিক নিয়োগ ও মেধা যাচাই একটি জটিল প্রক্রিয়া। কাজেই মেধা যাচাইয়ের প্রচলিত গতানুগতিক পদ্ধতিসমূহ পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে। নাহলে সুষ্টু মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৭. প্রশ্নপত্র ফাঁস

প্রশ্নপত্র ফাঁস, ঘন ঘন পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন ইত্যাদি ভাল ফল বয়ে আনছে না। যা মানব সম্পদ উন্নয়নে বড় আঘাত।

৮. বিসিএস নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতাঃ

পিএসসি'র একটি বাষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ২৮ তম বিসিএস এর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় চাহিদা পাঠায় ১২ আগস্ট ২০০৭, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় ২২ জানুয়ারি ২০০৮ এবং নিয়োগের সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিয়োগ দেওয়া হয় ১ ডিসেম্বর ২০১০। প্রায় ৩ বছর সময় লেগেছে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে যা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। নিয়োগের এই দীর্ঘসূত্রতা খুবই হতাশাজনক।[১৮]

[১৭] দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ জুলাই ২০১৪।
[১৮] দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ জুলাই ২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository

৯. প্রাধিকার কোটার পদ্ধতি সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক

বাংলাদেশে বিসিএস তথা ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরন করা হয়। যেমন:-

মেধা	৪৫%
মুক্তিযোদ্ধা	৩০%
মহিলা	১০%
উপজাতি	৫%
জেলা	১০%

নিয়োগের ৫৫% প্রার্থীই প্রাধিকার কোটার মাধ্যমে নিয়োগ লাভ করে যার মাধ্যমে মেধা ও যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে...

- এই পদ্ধতি ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে মেধা বিকাশের অন্তরায়।
- এতে অনেক সময় অযোগ্য লোক ও কম মেধাবী লোক নিয়োগ লাভ করে।
- কোটা পদ্ধতি অনগ্রসর নারী, মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেমের স্বীকৃতি ও অনগ্রসর জাতি ও অনগ্রসর জেলা গুলোকে সুবিধাদানের জন্য প্রনীত হয়েছিল। কিন্তু সেই লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হচ্ছে তা আজ বড় প্রশ্ন।

প্রথমত: নারী কোটার ক্ষেত্রে যারা BCS সহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহন করছেন, তারা সমাজের অবহেলিত নারীদের প্রতিনিধিত্ব করছেন কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ এক্ষেত্রে নারী কোটা নীতিগত উদ্দেশ্য পূরনে ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী ও মুক্তিযোদ্ধাগনের সংখ্যার তুলনায় মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র/কন্যা পোষ্যদের জন্য ৩০% কোটা সংরক্ষণ প্রশ্নের অবকাশ রাখে। তবে প্রশ্ন জাগে তারা আসলেই মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কি না? কেননা যে সরকার আসে তারাই নতুন করে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট দিচ্ছে। এমনকি এক সরকারের দেয়া সার্টিফিকেট অন্য সরকার বাতিল করে দিচ্ছে। এই দ্বন্ধের মাঝে অনেক অমুক্তিযোদ্ধাও সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছে। যেমন, গত ২৩ জানুয়ারি ও

৫ এপ্রিল ২০১৪ প্রকাশিত প্রথম-আলোর প্রতিবেদনে দেখা যায়, অন্তত চারজন সচিব একজন যুগ্ম সচিব, ও একজন সাবেক সচিব চাকুরির মেয়াদ বাড়াতে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সনদ সংগ্রহ করেন। এছাড়াও অন্য এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সনদ সংগ্রহের কারণে ৭/৮/২০১৪ পর্যন্ত ১৮২ জন সরকারি কর্মকর্তার মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল ও তাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ফৌজদারি মামলার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৯] এছাড়াও বাবার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ ব্যবহার করে ৩১ তম বিসিএস এ কাস্টমস ক্যাডার এ নিয়োগ পেয়েছে এরকম নজির ও আমরা দেখতে পাচ্ছি।[২০] যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটা চালু করা হয়েছিল তা আজ ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে।

তৃতীয়তঃ অনেক স্বল্প মেধাবী প্রার্থী জেলা কোটার কারনে অধিক মেধাবী প্রার্থীর চেয়ে বেশী পরিমানে নিয়োগ পাচ্ছেন। আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বে এটা গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। উপজাতি কোটার ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় সংশ্লিষ্ট পদের জন্য নূন্যতম যোগ্যতা নির্ধারনের পরও যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায় না। প্রশাসনে এ কোটার মাধ্যমে কখনও কখনও এত কম যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগ লাভ করে যা উদ্বেগ জনক।

চতুর্থতঃ বাংলাদেশে সরকারী চাকুরীর জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা সাধারণত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও PSC মিলে করে থাকে। কিন্তু এখানেও সরকারের নানা হস্তক্ষেপ রয়েছে। যদিও PSC স্বতন্ত্র সংস্থা তবুও আমরা দেখছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ করছে PSC তে।

পঞ্চমতঃ PSC তে চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। যে সরকার যখন ক্ষমতায় থাকে সে তার পছন্দ মত প্রার্থী নিয়োগ দেয়। ফলে দলীয় দৃষ্টি কোন থেকে নিয়োগ পাওয়া এই সব চেয়ারম্যান ও সদস্যরা দলীয় দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে ভাইভাতে নাম্বার দিতে চেষ্টা করে ফলে অযোগ্য প্রার্থী ও বেশী নাম্বার পেয়ে যাচ্ছে এবং ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগ পেয়ে যাচ্ছে।

[১৯] প্রথম-আলো, ২৩ জানুয়ারি, ৫ এপ্রিল ও ৭ আগস্ট ২০১৪।
[২০] প্রথম আলো, ২৩ মে ২০১৪।

১০. আর্থিক সমস্যাঃ

যে কোন দেশেই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু নানাবিধ সমস্যার আবর্তে নিপতিত আমাদের মত অনুন্নত দেশের পক্ষে এত বিপুল পরিমান অর্থ যোগান দেয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না। ফলে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অনেকাংশে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশিক্ষণে সমস্যা দেখা দেয়।

১১. আবাসিকতার সমস্যাঃ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আবাসিকতার সমস্যা একটি বড় সমস্যা হিসেবে বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে।

১২. যোগ্য প্রশিক্ষকের অভাবঃ অনেকক্ষেত্রে সরকারি কর্মীদের প্রশিক্ষন দানের জন্য প্রশিক্ষন প্রাপ্ত দক্ষ ও ধীশক্তি সম্পন্ন এবং আগ্রহী প্রশিক্ষকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ ধরনের প্রশিক্ষকের সংখ্যা আমাদের দেশে অতীব নগন্য। বিদেশ থেকে অর্থ ব্যয় করে প্রশিক্ষক এনে প্রশিক্ষণ দেওয়া দেশের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আমাদের দেশে এ সমস্যাটি সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ প্রদানের পথে বড় অন্তরায়।

১৩. যথাযথ তথ্যের অভাবঃ যে কোন প্রশিক্ষণার্থীকেই স্ব-স্ব কর্ম সম্পাদনে সত্যিকার অর্থে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত পরিসংখ্যান মূলক তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করে এত বেশী পরিমান তথ্য সংগ্রহ করা আমাদের দেশে সম্ভব হয়ে উঠছে না। ফলে পরিসংখ্যানমূলক তথ্যের অপ্রতুলতাও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটা বাধা স্বরূপ।

১৪. প্রয়োজনীয় পুস্তক ও উপকরনের অভাবঃ যেসব গ্রন্থ পাঠ করে প্রশিক্ষণার্থীরা ব্যবস্থাপনার জটিলতা সম্পর্কে সুক্ষাতি সূক্ষ্ম ধারনা লাভ করে সেসব গ্রন্থের অধিকাংশই বিদেশী। ফলে অর্থ ব্যয় করে বিদেশ থেকে এ জাতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করা প্রায় সব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের

পক্ষেই একটা অসম্ভব ব্যাপার। আর এজন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির অভাবেও অনেক সময় প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষন দানে অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হন।

১৫. **যান্ত্রিক সমস্যাঃ** বাংলাদেশের প্রায় সব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেই Audio visual কলা কৌশল যেমন কম্পিউটার ও ফটো কপি মেশিন ও প্রজেক্টর, টাইপ মেশিন, হিসাব রক্ষাকারী মেশিন এবং দলিলপত্র সংরক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এমন কি অফিসিয়াল নিত্য নৈমিত্তিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের বেশ অভাব বিদ্যমান।

১৬. **দুর্নীতিঃ** প্রশিক্ষনের জন্য যেসব অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় তার বেশীর ভাগই লোপাট হয়ে যায়। দুর্নীতির কারনে অর্থ লোপাটের কারনে প্রশিক্ষন কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

১৭. BPATC তে যেসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা কতটা বাস্তব সম্মত ও যুগ উপযোগী তা ভাবার সময় এসেছে। এখানে কম্পিউটার বা আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ আরো বৃদ্ধি করা উচিত।

১৮. প্রশিক্ষণ অনেকটা বাংলাদেশে Formalism এ পরিনত হয়েছে। ফলে প্রশিক্ষনের আসল উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে।

১৯. প্রশাসনিক দলীয়করণ

বাংলাদেশে প্রশাসনিক দলীয়করণের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে পদোন্নতি। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জেষ্ঠ্যতা ও মেধাকে পাশ কাটিয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিচয়কে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। সব সরকারের সময়ই এই সংস্কৃতি লালন করা হচ্ছে, যা কাম্য নয় ।

২০. আঞ্চলিকতাঃ

আঞ্চলিকতার কারনে অনেক অযোগ্য কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়ে যাচ্ছেন আবার অনেকে যোগ্য হয়েও পাচ্ছেন না। পদোন্নতির নির্দিষ্ঠ নীতিমালার অভাব বাংলাদেশের পদোন্নতির নির্দিষ্ঠ নীতিমালা নেই বা থাকলেও সেটা মানা হচ্ছে না।

২১. পদোন্নতির কর্তৃপক্ষঃ নিয়ে (দ্বন্দ)

পদোন্নতির সুপারিশ বা অনুমোদন করার কর্তৃত্ব কাকে দেওয়া হবে এ নিয়ে মত বিরোধ রয়েছে। অনেকে মনে করেন এ কর্তৃত্ব দেওয়া উচিত নির্বাচনকারী সংস্থা বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনকে। আবার কেউ কেউ বিভাগীয় প্রধানকে এ কর্তৃত্ব দেওয়ার স্বপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন। এ মত দুটির পক্ষে বিপক্ষে যথেষ্ঠ যুক্তি রয়েছে। বিভিন্ন উন্নত দেশে বিশেষ করে ব্রিটেনে পরবর্তী অবস্থা গৃহীত হয়েছে।

২২. বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন নিয়ে সমস্যাঃ

বাংলাদেশে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন অনেক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তৈরী হয় না, বা সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিবেদনে দক্ষতা মূল্যায়নের অন্যতম মাধ্যম ACR সম্মন্ধে যা বলা হয়েছে তা হল-

- বহুক্ষেত্রে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রতিবছর নিয়মিত রাখা হয় না।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ACR পাঠানোর ব্যাপারে দীর্ঘ সময় নেয়া হয়।
- প্রতিবেদনের মন্তব্যগুলি অনেকসময় পরস্পর বিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে
- বিরূপ মন্তব্য থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে জানানো হয় না।
- বহুক্ষেত্রে কয়েক বছরের প্রতিবেদন বাদ দিয়ে কেবলমাত্র এক বছরের ভাল কিংবা মন্দ প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

২৩. **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপঃ** রাজনৈতিক বিবেচনায় OSD করা প্রশাসনের নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে। ফলে দক্ষ ও যোগ্য সিভিল সার্ভেন্টদের সেবা থেকে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রশাসনে ৩৪৩ জন কর্মকর্তা OSD 'র যাতাকলে পিষ্ট হচ্ছে।[২১]

২৪. **উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধিঃ** অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের চাকুরিকাল চুক্তিভিত্তিতে বাড়ানোর প্রবনতা পদোন্নতির ক্ষেত্র সংকোচনে সহায়তা করছে।এর মাধ্যমে সরকার যদিও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়োগ করছেন কিন্তু উচ্চ প্রতিভা সম্পন্ন প্রতিশ্রুতিশীল কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুযোগ এ প্রক্রিয়ায় ব্যহত হয়। অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের চাকুরীর আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে তরুণ অফিসারদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

২৫. **পদোন্নতি পরীক্ষা পদ্ধতিতে অসংগতিঃ** আপাতঃ দৃষ্টিতে সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতির জন্য যে উদ্দেশ্যে পরীক্ষার বিধান করা হয়েছে তা মহৎ বলে প্রতিয়মান হয়। কিন্তু পদ্ধতিগত অসংগতি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অদুরদর্শীতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন স্বার্থবাদী মহলের তদবির ও চাপের কারণে সরকারের ঐ মহৎ উদ্দেশ্যটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

[২১] দৈনিক প্রথমআলো, ৪ জুলাই ২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় আটঃ সুপারিশমালা ও উপসংহার

১. সুশাসন এবং সচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে

প্রায়াত প্রফেসর মোজাফ্ফর আহমদ, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. আকবর আলী খান, ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এবং এম হাফিজুদ্দিন খান এর মত বিশেষজ্ঞদের মতে দেশের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রশাসনে সুশাসনের বড়ই অভাব। ড. মইনুল ইসলাম এর মতে, দুর্নীতি ও লুটপাটের কারণে এগোতে পারছেনা দেশ। ৯০ এর দশকের শেষের দিকে বিশ্বব্যাংকের গবেষণায় দাবি করা হয়েছিল, বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার প্রতি বছর এক শতাংশ কামিয়ে দিচ্ছে দুর্নীতি।[২২] সুতরাং মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য ও নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতিতে সুশাসন ও সচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

২. স্বাধীন সার্চ কমিটি গঠন করতে হবে

স্বাধীনতার পর থেকে সকল সরকারের সময়ই পিএসসি'র চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগে দলীয় পরিচয় ও স্বজনপ্রীতিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বলে সাক্ষাতকার দানকারীগণ মনে করেন। তাই পিএসসিতে দক্ষ, নিরপেক্ষ এবং পেশাগতভাবে সফল লোক নিয়োগদানের জন্য দেশের প্রথিত যশা এবং খ্যাতিমান ব্যক্তিদের নিয়ে স্বাধীন সার্চ কমিটি গঠন করা এখন সময়ের দাবি।

৩. বেতন কাঠামো যুক্তি সংগত ও বাস্তব সম্মত হতে হবে

বাংলাদেশে ২০০৯ সালের ২ ডিসেম্বর যে বেতন স্কেলের গেজেট প্রকাশিত হয়েছিল তাতে একজন বিসিএস ক্যাডার ক্যাডার সার্ভিসে যোগদান করার সময় ১১০০০ টাকা

[২২] মইনুল ইসলাম, "*দুর্নীতি ও লুটপাটের কারণে এগোতে পারছেনা দেশ*", দৈনিক প্রথম আলো, ১০ আগস্ট ২০১৪।

মুল বেতনে চাকুরীতে যোগদান করতে হচ্ছে, যা সবমিলিয়ে ২০,৩৭০ টাকায় দাড়ায়।[২৩] অপরদিকে একজন বেসরকারী চাকুরীজীবি ব্যাংকার তার থেকে কমপক্ষে দ্বি-গুন বেশী বেতনে চাকুরীতে যোগদান করছে যা প্রথমআলোতে প্রকাশিত UCB Bank এর বিজ্ঞপ্তী থেকে জানা যায়।[২৪] এই যে বেতন বৈষম্য তা যোগ্য ও মেধাবী তরুণদের ক্যাডার সার্ভিসে আকৃষ্ঠ ও ধরে রাখতে পারছে না। তাই বেতন কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন এনে মেধাবী ও যোগ্য তরুণদের ক্যাডার সার্ভিসের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে, না হলে সিভিল সার্ভিস মেধাহীন হয়ে পড়বে। তাই সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়নে বেতন কাঠামো বৃদ্ধি আবশ্যক।

৪. ভাল রেজাল্টকে আরো গুরুত্ব দিতে হবে

নূন্যতম যোগ্যতা নির্ধারন করে ভাল রেজালটকে আরো গুরুত্ব দিতে হবে। নিয়োগ নীতিমালায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। পাবলিক পরীক্ষার রেজাল্ট কে আরো বেশী গুরুত্ব দিয়ে শর্ত জারি করতে হবে। যাতে ভাল রেজাল্ট করে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহী হয়।

৫. প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধে কঠোর আইন ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে

বর্তমানে BCS পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাস একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। ২৭ তম বিসিএসে প্রশ্ন ফাস ও তার ব্যাপক অনিয়ম এর কারনে এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহনকারীদের ভোগান্তির চিত্র আমরা দেখেছি। ৩৩ তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের কারনেও এই পরীক্ষা স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছিল PSC। তাই প্রশ্ন পত্র ফাস রোধে আরো কঠোর ও কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

[২৩] বাংলাদেশ গেজেট ০২ ডিসেম্বর ২০০৯।
[২৪] দৈনিক প্রথম আলো, ১২/০৮/১৪

Dhaka University Institutional Repository

৬. মানব সম্পদ উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিতে হবে

মানব সম্পদ উন্নয়নে আরো যুগ-উপযোগী ও বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। কারন দক্ষ মানব সম্পদ ছাড়া দেশে উন্নয়ন, অগ্রগতি সম্ভব নয়। যা দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও চীনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি। কারণ আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল মানব সম্পদ।

৭. কোটা ব্যবস্থার পুণর্বিন্যাস করতে হবে

নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাকে আরো গুরুত্ব দিতে হবে। কোনভাবেই মেধা কোটা প্রাধিকার কোটার নীচে হতে পারে না। ড. আকবর আলি খান, কাজী রাকিব উদ্দিন আহমদ ও বিভিন্ন প্রশাসনবিদের মতে প্রাধিকার কোঠা কোনভাবেই মেধা কোটার চেয়ে বেশি হওয়া উচিৎ নয়। বিসিএস সহ সকল নিয়োগ পরীক্ষায় মেধা কোটা প্রাধিকার কোটার চেয়ে বেশি হতে হবে। প্রাধিকার কোটাকে নিম্নোক্ত ভাবে কমাতে হবে। যেমন-

- নারীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে মানদন্ড পুর্নবিবেচনা করা প্রয়োজন। কোটা পদ্ধতির পরিবর্তে এবং মেধা ভিত্তিক পদ্ধতি বহাল করে তাদের বয়সসীমা ৩৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যাতে তারা অধিক সংখ্যকবার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করতে পারে।
- বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/পোষ্যদের কোটা সংখ্যা ৩০% হতে কমানো প্রয়োজন। বাকী অংশ মেধা পদ্ধতির সাথে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মুক্তি যোদ্ধা কোটা বেধে দেওয়া উচিত।
- উপজাতি কোটার ক্ষেত্রে নিয়োগের পরও যে সব পদ শূণ্য থাকবে তা মেধার সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে।
- মেধাভিত্তিক নিয়োগ পরীক্ষার পদ্ধতিসমূহ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে না বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতি বিজ্ঞান ও বাস্তব সম্মত করা প্রয়োজন।

- সরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। কেননা নিয়োগ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে আসলে অযোগ্য লোকপ্রশাসনে ঢুকে যেতে পারে।
- প্রশাসনে ICT র ব্যবহার এখনও কাঙ্খিত মাত্রায় পৌছায়নি। যার কারনে কম সময় ও কম খরচে সরকারী সেবা জনগণের দোড় গোড়ায় পৌছাচ্ছে না।

৮. অফিসের কর্ম পরিবেশ উন্নত করতে হবে

সরকারি চাকুরী পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে হবে সরকারী অফিস গুলোতে পর্যাপ্ত অফিস ডেকোরাম, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ দিতে হবে। IT এর ব্যবহার সকল সরকারী অফিসে ছড়িয়ে দিতে হবে।

৯. দুর্নীতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে

দুর্নীতি বোধ করে প্রশিক্ষণে বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার করতে হবে। এবং দুর্নীতি ও আত্মসাৎ রোধ করতে হবে। নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংসদীয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং স্ব-স্ব বিভাগীয় দুর্নীতি দমন সেল গঠন করতে হবে।

১০. বিসিএস এ নিয়োগের দীর্ঘসুত্রতা দূর করতে হবে

বিসিএস এর সবস্তর বিশ্লেষন করলে দেখা যায় বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের পর কালক্ষেপণ না করলে নিয়োগ দেওয়া পর্যন্ত সর্বমোট আট মাস প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে সবমিলিয়ে প্রায় তিন বছর লেগে যাচ্ছে। বিসিএস এ নিয়োগের দীর্ঘসুত্রতা দূর করতে পিএসসি কে আন্তরিক হতে হবে এবং নতুন পন্থা বের করতে হবে।[২৫]

[২৫] তুহিন ওয়াদুদ, (২০১৪), "নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতা দূর হবে কি?" দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ জুলাই, ২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository

১১. প্রশিক্ষণে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিতে হবে

প্রশিক্ষণের অর্থের বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমান অর্থের বরাদ্দ দিতে হবে মানব সম্পদ উন্নয়নে। BPATC এর সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানটিকে আরো যুগউপযোগী ও আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

১২. যোগ্য প্রশিক্ষক বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশাসনের দক্ষ ও অভিজ্ঞ আমলাদের BPATC তে নিয়োগ দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩. আমাদের ICT প্রশিক্ষনের প্রতি আরো অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ICT, প্রশিক্ষন প্রতিটি ক্যাডার সার্ভিসে বাধ্যতামূলক করা উচিত। এবং ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করা উচিত।

১৪. যথাযথ তথ্যের যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং প্রয়োজনীয় পুস্তক ও উপকরনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। যাতে প্রশিক্ষণ আরো ফলপ্রসু হয়।

১৫. যান্ত্রিক সমস্যা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৬. মেধাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে

পদোন্নতির ভিত্তি হবে মেধা। বাংলাদেশের প্রধানত ও নীতিগতভাবে মেধা এবং জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়ার প্রথা চালু থাকলেও কার্যত জ্যেষ্ঠতাকে মেধার উপরে স্থান দেওয়া হচ্ছে। ফলে মেধাবী কর্মকর্তাদের মাঝে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে এবং কর্মদ্দোম হারাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে দেওয়া উচিত নয়। মেধাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রথা বাতিল করতে হবে

প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। কারণ চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

১৮. নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে

স্বাধীনতার পর থেকে পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষনের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়ে আসছে। সকল সরকারই তাদের স্বার্থ রক্ষার স্বার্থে আমলাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজেদের উপযোগী কর্মীর পদোন্নতি নিশ্চিত করছে। ফলে মেধা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন হচ্ছেনা। ১৯৯১ সালের কনসাল্টেশন রেগুলেশনের মাধ্যমে সরকার সরকারি খাতে অনেক পদোন্নতির ক্ষমতা নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছে যা বাতিল করা এখন সময়ের দাবি।

১৯. পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা পদ্ধতিতে অসংগতি দূর করতে হবে।

২০. সার্বজনিন পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে

সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতির জন্য যে উদ্দেশ্যে পরীক্ষার বিধান করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। পদোন্নতির সমস্যা সমাধানের জন্য সিভিল সার্ভিসের সামগ্রিক জনশক্তি পরিকল্পনার ভিতর একটি সার্বজনিন পদোন্নতি নীতি প্রণয়ন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

২১. ACR এর অসংগতি দূর করতে হবে। Annual Performance Report (APR) কে আরো গুরুত্ব দিতে হবে।

২২. ড. আকবর আলী খানের মতে, প্রশাসনে ভালো পারফরমেন্স এর উপর পুরষ্কারের ব্যবস্থা না থাকায় প্রশাসনের মান দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং, প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে

দক্ষতা এবং যোগ্যতাকে উৎসাহিত করতে হবে এবং সততা এবং ভালো কাজের জন্য পুরষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৩. Four Secretary Report এ চারজন বিজ্ঞ আমলা পদোন্নতির বিভিন্ন সমস্যাদি লক্ষ করে কতিপয় সুপারিশ প্রদান করেছেন। সুষ্ঠ পদোন্নতি ব্যবস্থার জন্য এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। রিপোর্টে সুপারিশকৃত পদোন্নতি ব্যবস্থা নিচের ছকের মাধ্যমে দেখান হয়েছে।

চিত্র: পদোন্নতির সুপারিশকৃত প্রক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অনেক সমস্যা বিদ্যমান। সুদীর্ঘ কালের ঔনিবেশিক শাসন আর অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও নিপীড়নের জিঞ্জির পেরিয়ে ৩০ লাখ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বের পিছিয়ে পড়া ৫০ টি স্বল্পোন্নত দেশের অন্যতম। আমাদের হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যে পূণ্যস্নাত মাতৃভুমি বাংলাদেশ তার নাগরিকের জীবনমানে এক হতাশাদীর্ণ জনপদ, এ হতাশার অন্তর্গত কারণ বহুবিধ। তাতে আছে হাজার বছর ধরে শাসকের শোষণ বঞ্চনা ও খামখেয়ালিপনা, মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালশ্রেণীর নির্লজ্জ লুটপাট ও মোসাহেবী, দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র, রাজনীতিকদের হটকারিতা, প্রকৃতির বিরূপতা এবং এতসব নেতিবাচক উপাদানের ফলস্বরুপ অশিক্ষা, প্রযুক্তি বিমুখতা ও অব্যবস্থাপনা, বেকারত্ব, খাদ্যাভাব, জনসংখ্যার আধিক্য, দুর্নীতি ও ক্ষমতাবানদের লুটপাট, আধুনিক মেধামননের অপ্রতুলতা, ধর্মান্ধতা সামগ্রিক জাতীয় চৈতন্যে প্রোথিত। সুতরাং ব্যাহত এ দেশের অগ্রগতি। এ অবস্থায় প্রশ্নবিদ্ধ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের এক একটি মাইল ফলক তথা মুক্তি সংগ্রামের পথে স্থাপিত এক একটি গৌরবজ্জল স্তম্ভ: ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি। কারণ এসব আন্দোলন সংগ্রামে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের অভিন্ন কারণ ছিল সমৃদ্ধ দেশ গড়া।

বাংলাদেশের মানুষের কাঙ্খিত অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার মূল কারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা। কারণ শত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে কেবল দক্ষ প্রশাসন ও পরিচালনা ব্যবস্থাই পারে মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাতে। আর দক্ষ প্রশাসন গড়তে হলে অবশ্যই মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। একথা আজ প্রমাণিত যে আমাদের আজ সম্পদের অভাব নেই কিন্তু এদেশের অগ্রগতির জন্য সেই ঔপনিবেশিক আমলে যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো অচল ছিল তা বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জের যুগে আজও বিদ্যমান। বিশ্বায়নের যুগে ই-গভর্নেন্স, মুক্তবাজার অর্থনীতি ও প্রযুক্তির কোন সুফল নিতে সমর্থ হয়নি বাংলাদেশ। এর অন্যতম কারণ সনাতনি

প্রশাসনিক কাঠামো। এই গবেষণার দীর্ঘ পাঠ বিভিন্ন তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত, ঐতিহাসিক বিবেচনা, সমকালীন ভাবনা ও বাস্তবতার নীরিখে এটাই প্রতীয়মান করে যে, যুগোপযোগী সরকারি সংগঠন তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছাড়া একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন অসম্ভব। সেকারণে সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন এখন সময়ের দাবি। চলমান বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো, জনগণের জীবনমান তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, সুশাসন ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার নীরিখে সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বাংলাদেশের সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নেই। আমাদের প্রত্যাশা ও প্রচেষ্টাও সেখানেই।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

সহায়ক গ্রন্থাবলী

- আহমেদ, তোফায়েল, (২০০১), *কর্মী ব্যবস্থাপনা*, তানিম প্রকাশনি, ঢাকা।
- আহমদ, এমাজউদ্দীন (২০০২), *"বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন"*, অনন্যা, ঢাকা।
- ইসলাম, মো: নুরুল, (২০১০). *মানব সম্পদ উন্নয়ন"* তাসমিয়া পাবলিকেশন্স ঢাকা।
- কামাল, মাসুদা, (২০০৯), *"বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন:কতিপয় প্রসংগ"*, অসডার পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, চাকুরী বিধিমালা।
- চৌধুরী, আব্দুল মান্নান, (অগ্রহায়ণ, ১৩৮০), *প্রেষণাতত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষন*,' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১ম খন্ড।
- মহিউদ্দিন, মোহাম্মদ, (২০০৬) *"মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা।
- মিলি, আলম, রহমান, (২০১০) *"লোক প্রশাসন: তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক রূপরেখা"*; তানহা পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
- বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১২-১৩, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ০২ ডিসেম্বর ২০০৯।
- ভূইয়া, মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ, (২০০২), *লোকপ্রশাসনের রূপরেখা*, গ্লোব লাইব্রেরী লিমিটেড, ঢাকা।
- রহমান, মোহাম্মদ শামসুর, (২০০৬), *"লোকপ্রশাসন তত্ত্ব ও বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন"* খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা।

- রেশমা, আফরোজা (২০১২), *"বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কার (১৯৭২-২০০০)*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা।

- শওকতুজ্জামান, সৈয়দ, (১৯৯৭), উন্নয়ন পরিকল্পনা, শাহানা পাবলিশার্স, ঢাকা।

- সেন, অমর্ত্য, (১৩৯৭) জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি, কলিকাতা, পৃ: ১২১

- Ahmad, Mushleh Uddin, (1988), Development Administration, Concepts and Issues, Dhaka, Osder Publications.

- Ahmed, Syed Gias Uddin (1986). "*Public Personnel Administration in Bangladesh*", the University of Dhaka, Bangladesh.

- Ali, A.M.M. Shawkat, (1993), "*Aspects of Public Administration in Bangladesh*", Dhaka, Nikhil Prakasan.

- …… (2004), *Bangladesh Civil service-Apolitical-Administrative perspective*. UPL, Dhaka.

- Dawra, Sudhir, (2003), "Human Resource development" Rajat Publications, New Delhi, India.

- Dimock M.E. Dimock G.O. *Public Administration* 3rd ed. (New Delhi:1964)

- Government of Bangladesh, *The Constitution of the Proples republic of Bangladesh.*

- Islam, Shamsul, Public Corporations in Bangladesh (1975), NILG, Dhaka.

- Islam, Monoar (2013), "*Human Resource and Performance Management System for Bangladesh Civil Service.*" OSDER Publications, Dhaka.

- *"Civil Service Training in Bangladesh, an Institutional Analysis of BPATC Role, Rhetoric and Reality."* A H Development Publishing House, Dhaka.

- Khan, Akber Ali, and Ahmed, Kazi Rakibuddin Ahmed, (2008), *"Quota System for Civil service Recruitement in Bangladesh : An explotory analysis.*

- Khan, M Mohabbat and Habib M Zafarullah (2005), *The Bureaucratic Ascendancy: Public Administration in* Bangladesh *– The First Three Decades,* India: South Asian Publisher.

- Rashid, Sheikh Abdur. (2008), *Civil Service at the Cross-roads-Astudy of therecruitement, training, performance and prospect of B.C.S. (Admn) Cadre.'* Muktochinta Prokashona, Dhaka.

- Rahman, A.T.R (2001). "*Reforming the Civil Service for Government Performance-A partnership Perspective*." UPL, Dhaka.

- Zafarullah, H., & Khan, M.M. (2005), "*Bureaucratic ascendancy, public administration in Bangladesh: The first three decades".* AHDPH, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা সাময়িকী

- Alam, Mohammad Saiful, (1993), "*In quest of an effective Performance Apprisal System foe the Bangladesh Civil Service*" a dissertation of hiss masters in Social Science in Development Administration.

- Alam, Manzoor (2006), *Role and Effectiveness of Bangladesh Civil Service in Achieving Millennium Development Goals*, Preparatory Assistance on Developing Civil Service Capacity for the 21st Century Administration, London: Public Administration International, p.9.

- Aminuzzaman, Salauddin (2006), "*Analysis of Performance Apprisal and Management and Career Planing of Class 1 Civil servant of Bangladesh,"* diagnostic Report, World Bank.

- Centre for Governance Studies (CGS). (2006). *The state of governance in Bangladesh 2006: Knowledge, perceptions, reality*. Dhaka: CGS.

- Ehsan, Mohammad (2008),"*Public sector human resource management in bangladesh: Challenges and opportunities in light of the wpsr 2005*"**,** Asian Affairs, Vol. 30, No. 4 : 50-75, October-December, 2008

- Huque, A Shafiqul and Firowz Ahmed (1992), "Public Personnel Administration: Tradition, Problems and Issues in Bangladesh", *Asian Journal of Public Administration,* Volume 14, No. 1, p.36.

- Jahan, Ferdous (2006), *Public Administration in Bangladesh*, Dhaka: Centre for Governance Studies, BRAC University.

- Jahan, Ferdous and A.M. Shahan, (2012), "*Bureau Bashing and Public Service Motivation: A Case for the Civil Service of*

Bangladesh", International Journal of Public Administration, 35: 272–284.

- Kabir, Syeda Lasna and Baniamin, Hasan Muhammad, (2012)

- Kelly D. (2001), *Dual Perspective of HRD:Issues for Policy:SME's, Other Constituencies, and the Contested Definition of Human Resource Development,* http/ro.uow.edu.au/artspaper/26

- Nasreen, Farida (2006), "*Analysis of performance Aapprisal System of Bangladesh Civil Service and Scope of its Improvement'*. Bangladesh Journal of Public Administration, Volume XV, Number I & II, BPATC, Dhaka.

- Obaidullah, ATM. (1995). "*Recognization of pay policy and Structure in Bangladesh: The Quest for living Wage*"

- Rafiqul Islam, *Human Resource Development in Rural Development in Bangladesh*, NILG, Dhaka-1990.

- Siddiquee, Noore Alam; (2003), Human Resource management in Bangladesh Civil Service: Constraints and Contradictions," International Journal of Public Administration, Vol.26.

- Suojanen W.W Hicks. HG, (1968) "*Management Organization and Human Resources*," (selected Readings), New York.

- UNDP (2007), *Building 21st Century Public Administration in Bangladesh: Formulation Mission Report*, Dhaka: UNDP.

- UNDP (2007), *Role and Capacity of Bangladesh Public Service Commission*, Dhaka: UNDP;

- World Bank (1996), *Government that Works Reforming the Public Sector.*

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক দৈনিক পত্রিকা

- ইসলাম, মইনুল, (২০১৪), "*দুর্নীতি ও পুজি লুটেরাদের তান্ডব*", দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ জুন, ২০১৪।

- .....(২০১৪), "*দুর্নীতি ও লুটপাটের কারণে এগোতে পারছেনা দেশ*", দৈনিক প্রথম আলো, ১০ আগস্ট ২০১৪।

- মজুমদার, আলী ইমাম, (২০১৪) "*প্রশাসনের গায়ে রাজনীতির জামা*" দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ এপ্রিল, ২০১৪।

- .....(২০১৪) " *সমস্যা প্রিলিমিনারি নয়*" দৈনিক প্রথম আলো, ২১ মে, ২০১৪।

- ওয়াদুদ, তুহিন, (২০১৪), "*নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতা দূর হবে কি?*" দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ জুলাই, ২০১৪।

- শেখর, সৌমিত্র (২০১৪), "প্রশ্নপত্র পরিবর্তন কেন'', দৈনিক প্রথম আলো, ৫ জুন, ২০১৪।

- দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ আগস্ট ১৯৯৭।

- দৈনিক প্রথম আলো, শনিবার, ১০ মার্চ, ২০০৭।

- দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০১০, পৃ. ১-২।

- দৈনিক প্রথমআলো, ২৩ জানুয়ারী ২০১৪, পৃ. ১।

- দৈনিক প্রথমআলো, ৫ এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ১।

- দৈনিক প্রথমআলো, ১৫ মে ২০১৪, পৃ. ১০।

- দৈনিক প্রথমআলো, ২৩ মে ২০১৪, পৃ. ১০।

- দৈনিক প্রথমআলো, ৪ জুলাই ২০১৪, পৃ. ১০।
- দৈনিক প্রথমআলো, ২৬ জুলাই ২০১৪, পৃ. ১০।
- দৈনিক প্রথমআলো, ৭ আগস্ট ২০১৪, পৃ. ১০।
- The Independent, 29 January 1996.

সহায়ক ওয়েব সাইট

- Academy for Planning and Development
  http://www.plancomm.gov.bd/_planning_scsdemy.asp
- Bangladesh Civil Service Administration Academy
  http://www.bcsadminacademy.gov.bd
- Bangladesh Public Administration Training Centre
  http://www.bpatc.org.bd
- Financial Management Academy
  http://www.fima.gov.bd
- Foreign Service Academy
  http://www.mofa.gov.bd
- Land Administration Training Centre
  http://www.latc.gov.bd
- Ministry Of Public Administration
  http://www.mopa.gov.bd
- Police Staff College Bangladesh
  http://www.psc.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

সংযজোনী

"সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক এম, ফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষনাঃ লোকপ্রশাসন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নামঃ . . . . . .

পদবীঃ . . . .

প্রশাসনিক স্তরঃ . . . . . .

বয়স : . .. .

সবোর্চ্চ ডিগ্রী : . . . . . .

সাধারণ প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে দক্ষ মানব সম্পদের প্রভাব কতটুকু?

২. সরকারি সংগঠনে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির কৌশল কি বাংলাদেশে সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে?

৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৪. মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন একটি সংগঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

৫. বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়নকল্পে কি পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া রয়েছে?

৬. সরকারি সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়নকল্পে যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া রয়েছে তা কি পর্যাপ্ত?

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগঃ

১. বাংলাদেশের সরকারি সংগঠন তথা সিভিল সার্ভিসের নিয়োগ প্রক্রিয়া কি দক্ষ মানব সম্পদ সংগ্রহে যথাযথ ভুমিকা পালন করছে?

২. যথাযথ ভুমিকা পালন না করলে কি কি ত্রুটি বা দূর্বলতা রয়েছে?

৩. কিভাবে দূর্বলতাগুলি দূর করা যায়?

৪. বিসিএস এ কিভাবে আরো বেশি মেধাবী ও যোগ্য মানব সম্পদ নিয়োগ করা যেতে পারে?

৫. নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরো আধুনিক ও যুপোযোগী করতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী?

৬. বিসিএস এ নিয়োগের মানদন্ড কি হওয়া উচিত? ভাল রেজাল্টকে আরো গুরুত্ব দেওয়া যায় কিনা?

৭. বিসিএস এ নিয়োগের ক্ষেত্রে পিএসসি এর ভূমিকা কি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে? কিভাবে পিএসসি'র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আরো বাড়ানো যায়?

প্রশিক্ষণ

১. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পর্যাপ্ত কি না?

২. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি IT Based কি না?

৩. বাংলাদেশের সরকারী সংগঠনে প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে আইটি এর ব্যবহার যথেষ্ঠে কি না?

৪. দক্ষ ও কার্যকরী মানব সম্পদ উন্নয়নে এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কতটুকু ভুমিকা পালন করছে?

৫. প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে আরো কার্যকরী ও যুগোপযোগী করতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

৬. প্রশিক্ষণ পদ্ধতির দূর্বল দিকগুলো কি কি?

৭. একাবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাই এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পর্যাপ্ত কি না?

৮. কিভাবে আই টি তে দক্ষ ও আই টি নির্ভর সরকারী সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

৯. সরকারী সংগঠনে মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ পর্যাপ্ত কি না?

১০. প্রশিক্ষণে আরো বেশি অর্থ বরাদ্দ ও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না?

১১. দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কেন সবচেয়ে বড় ভুমিকা পালন করে?

১২. বাংলাদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ Logistic ও Instrumental Support আছে কি?

১৩. পর্যাপ্ত পরিমান দক্ষ প্রশিক্ষক আছে কি?

১৪. সিভিল সার্ভিসে মানব সম্পদ উন্নয়নে BPATC এর ভূমিকা কি যথার্থ?

১৫. BPATC এর প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে আরো কার্যকরী ও যুগোপযোগী করতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

পদোন্নতি

১. বাংলাদেশের সরকারী সংগঠনে পদোন্নতি পদ্ধতি গুলি কি কি?

২. পদোন্নতির মানদন্ডগুলি কি কি ?

৩. পদোন্নতির মানদন্ডগুলি কি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়?

৪. অনুসৃত নীতিগুলি কি যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে কার্যকরি ভুমিকা পালন করছে?

৫. অনুসৃত নীতিগুলির দূর্বলতা রয়েছে কি না বা নীতিগুলির অপব্যবহার হচ্ছে কিনা?

৬. একাবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাই পদোন্নতির মানদন্ড বা পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন কি না?

৭. দলীয়করণ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের সরকারী সংগঠনের মানব সম্পদ উন্নয়নে কিরূপ প্রভাব ফেলছে?

৮. বাংলাদেশে দক্ষ মানব সম্পদ কমে যাওয়ার কারণগুলি কি কি?

৯. দক্ষ ও আধুনিক সরকারি সংগঠন তথা সিভিল সার্ভিস গড়ে তুলতে আরো কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? সিভিল সার্ভিসের দক্ষতার মান দিন দিন কমে যাচ্ছে কেন?